ক থা স ত্য ম ত ল ব খা রা প

মুহাঃ হেমায়েত উদ্দীন

ইমাম ও খতীব-বায়তুল আতীক জামে মসজিদ
পশ্চিম নাখালপাড়া,তেজগাঁও,ঢাকা-১২১৫
মুহাদ্দিস-জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া,ইসলামপুর, ঢাকা-১১০০

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল আশরাফ
৫০,বাংলাবাজার,ঢাকা-১১০০
ফোনঃ০১১৮৩৭৩০৮

কথা সত্য মতলব খারাপ
মুহাঃ হেমায়েত উদ্দীন

প্রথম প্রকাশঃ
এপ্রিলঃ ১৯৯১
চৈত্রঃ ১৩৯৭
রমজানঃ ১৪১১

দ্বিতীয় সংস্করণ
ডিসেম্বরঃ ২০০১
শা'বানঃ ১৪২২ হিঃ
অগ্রহায়নঃ ১৪০৮

প্রকাশক
হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
৫০, বাংলাবাজার,ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ০১১৮৩৭৩০৮

মুল্যঃ ৫০.০০

(লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

KATHA SATTYA MATLAB KHARAP
Trwe words but Motivated. Written by Md. Hemayet uddin in bengali
Published by MAKTABATUL- ASHRAF
50,Banglabazar, Dhak

উৎসর্গ

বাতিলের মুখোশ উন্মোচনে

ভূমিকা রাখবে যারা

তাদের নামে

-হেমায়েত উদ্দীন

MAKTABATUL ABRAR

সচীপত্র

কথা সত্য মতলব খারাপ

লেখকের কথা

‘কথা সত্য, মতলাব খারাপ’ শীর্ষক এই লেখাটি মাসিক পাথেয়-তে দীর্ঘদিন ধরে (মার্চ ১৯৮৮ থেকে অক্টোবর ১৯৮৯ পর্যন্ম) প্রকাশিত একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি পাঠক মহলে আশাতীতভাবে সমাদৃত হয়। উক্ত পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে বহুবার পাঠক মহল থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে লেখাটির জন্য প্রশংসা এবং তাদের আকর্ষণ ব্যক্ত করে লেখাটি চালিয়ে যাওয়ার এবং সবশেষে পুস্কাকারে সেটা হাতে পাওয়ার আকাংখা প্রকাশ করেন। পাঠক মহলের সেই আকাংখা আজ পরিপর্ণ বাস্বে রূপ নেয়ায় আমি বেশ আনন্দবোধ করছি। সব কিছুর জন্য আলণ্ঢাহর শুকরিয়া এবং সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। পুস্কটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ায় ‘আল আমীন পরিষদ কুমিলণ্ঢা’-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। লেখাটির এক স্থানে হক্কানী পীর মাশায়েখদের নাম ভাঙ্গিয়ে ভন্ড পীর-ফকীররা যে সব কুকান্ড চালিয়ে যাছে তার সমালোচনা করার কারণে জনৈক পাঠক ক্রুদ্ধ হয়ে আমার উপর যে সব জঘণ্য ধরনের আক্রমণ চালিয়েছিলেন ‘পাথেয়’-এর সংশিণ্ঢষ্ট কলামেই আমার পক্ষ থেকে তার ভদ্রোচিত জবাব দেয়া হয়েছিল। নিয়মিত পাঠকরা সেটা অবগত রয়েছেন বলে আশা করি। অতীত বা ভবিষ্যতের এ ধরনের জ্ঞান পাপী বা অজ্ঞ লোকদের উপর কর ণা করা বৈ গত্যন্তর নেই।

কিঞ্চিত পরিবর্দ্ধন ও পরিমার্জন সহকারে লেখাটি পাঠক মহলে পেশ করা হল। বিষয়বস্তুর কারণে, তদুপরি উপস্থাপনাকে রসাপণ্ঢুত করতে গিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু গাম্ভীর্যহীন শব্দের প্রলেপ মাখাতে হয়েছে, পাঠক মহল সেটাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা রাখি। লেখাটি থেকে যদি কেউ এতটুকু উপকৃত হন তা হলেই আমার শ্রমকে সার্থক মনে করব।

বেশ কয়েক বৎসর যাবত ‘আল আমীন পরিষদ কুমিলণ্ঢা’-এর কর্ম তৎপরতা সজীব না থাকায় পুস্কটির পুনঃমুদ্রণ হতে পারেনি। পুস্কটির গুর ত্ব ও পাঠক মহলের চাহিদা পরণের প্রেক্ষাপটে মাকতাবাতুল-আশরাফ কর্তৃক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের মহতি উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ জন্য মাকতাবাতুল-আশরাফ কর্তৃপক্ষকে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

মুহাঃ হেমায়েত উদ্দীন

ইমাম ও খতীব- বায়তুল আতীক জামে মসজিদ

পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও,ঢাকা-১২১৫

কথা সত্য; মতলব খারাপ

“কালিমাতু হাক্কিন উরীদা বিহাল বাতিল”-এ কথাটা আরবীতে একটা প্রসিদ্ধ বাগধারা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। কথাটা প্রথম বলেছিলেন চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)। এর একটা পটভূমিকা আছে-হযরত আলী (রঃ) এবং অহী লেখক হযরত মুআবিয়া (রাঃ) উভয়েই সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল ইজতিহাদের মতপার্থক্য। তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান (রাঃ)-এর হত্যাকান্ডের বিচারকে কেন্দ্র করে এর সত্রপাত হয়। এ মতপার্থক্যের মধ্যে ষড়যন্ত্রকারী ছদ্মবেশী একদল মুনাফিক ইন্ধন যোগায় , যাদের অধিকাংশই ছিল ইয়াহুদী। মুসলিম সমাজে ফাটল ধরানোর জন্য সুযোগ বুঝে ওরা নানা রকম ভুল তথ্য ছড়াতো। ওদের একদল যায় হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে আর একদল যায় হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর সাথে। হযরত আলী (রাঃ) শেষ পর্যন্ত ওদেরকে চিহ্নিত করে তার দল থেকে খারিজ করে দেন। এরাই ইতিহাসে খারেজী (দল ত্যাগী) নামে খ্যাত। ওদের শ্লোগান ছিল ‘ইনিল হুকমু ইন্না লিল্লাহ’ অর্থাৎ,আল্লাহ ছাড়া আর কারও নির্দেশ চলতে পারেনা। কথাটা কুরআনের একটা আয়াত। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উছমান (রাঃ)-এর নৃশংস হত্যাকান্ডের বিচারকে কেন্দ্র করে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত সিফফীনের যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে যখন দুইজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হয়, তখনই খারেজিরা এই রাজনৈতিক শ্লোগানের সৃষ্টি করে। দরদর্শী বিচক্ষণ সাহাবী হযরত আলী (রাঃ)-এর ভাষায় খারেজীদের এ কথাটা ছিল ‘কালিমাতু হাককিন উরীদা বিহাল বাতিল’ অর্থাৎ, কথাটা সত্য, তবে মতলব খারাপ। (কেননা, খারেজিরা এ শ্লোগানের মাধ্যমে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত তথা সুন্নাহকে অস্বীকার করত।)

ভাল কথার পেছনেও যে খারাপ উদ্দেশ্য লুকায়িত থাকতে পারে,সত্য কথা বলেও যে বিভ্রান্তি ছড়ানো যায়, তা হযরত আলী (রাঃ)-

এ কথায় সুস্ ষ্টভাবে উলেণ্টখিত হয়েছে। সাফ-ছুতরা মন্দ কথা বলে কাউকে প্রতারণা করা, অকপট মিথ্যা দ্বারা মতলব সিদ্ধির তুলনায় বরং এ পথটি বেশ নিরাপদ ও সহজসাধ্য। এভাবে শিকার যেমন খুব দ্রুত সহজে বাগে এনে ফিতনা-ফ্যাসাদ ছড়ানো যায়, আবার নিজেকেও কোন ঝুঁকিতে ফেলতে হয়না। মুখে শেখ ফরীদ বোগলমে ইট এবং লেফাফা দোরস্- লোকদের খপ্পরে অনেকে তাই পড়ে যায় বেঘোরে। পদ্ধতিটা বড় মোক্ষম। তাই বোধ হয় এই পদ্ধতি ধরার ফলে ইসলামের ইতিহাসে খারেজী দল অনেক ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। আর পরবর্তীতেও যুগে যুগে বাতিলরা এই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে এবং নিচ্ছে।

হালে কিছু কিছু শব্দ প্রায়ই শোনা যায়, যা আভিধানিক অর্থে সত্য হলেও তার মতলব বড় খারাপ। ফলে অতি সহজেই সে শব্দগুলি সাম্প্রতিক মন মানসিকতাকে ধাঁধাঁয় ফেলে দিচ্ছে। একটা দুটো নয় এমনতর শব্দের বাজার এখন রমরমা । এ যেন একটা শাব্দিক ধাঁধাঁর যুগ। রীতিমত অনেকের চোখে মুখে চিন্তা- চেতনায় এবং মন-মগজে ধাঁধাঁ লাগছে। আর তার পরিণতি যা হবার তাই হচ্ছে, সত্যকে অসত্য আর অবাস্তবকে বাস্তব বলে ভাবনার ভেল্কি চক্করে আমরা সবাই দোল খাচ্ছি দস্তুর মত।

মুক্তবুদ্ধি, মুক্তমন

এই যেমন ধরুন একটা শব্দ “মুক্তবুদ্ধি” বা “মুক্তমন”। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কথাটার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন বলা হয়ে থাকে মুক্ত বুদ্ধি নিয়ে কুরআন ও হাদীছ অনুধাবন করতে হবে, মুক্ত মনেই অধ্যয়ন করতে হবে কুরআন ও হাদীছ। মুক্ত শব্দের অর্থ বাঁধা- বন্ধন হীন,খালাস প্রাপ্ত, অব্যাহতি প্রাপ্ত, খোলা, অবাধ, অবারিত। শব্দটি বিশেষণ, এর সাথে যুক্ত বিশেষ্যের প্রেক্ষিতে এ অর্থগুলির উপযুক্ত যে কোন একটাকে সংশিণ্টষ্ট ক্ষেত্রে গ্রহণ করে নেয়া হয়। যেমন ঃ রোগ মুক্ত অর্থাৎ ,রোগ হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত। মুক্ত ধারা অর্থাৎ ,অবাধ অবারিত প্রবাহ, মুক্ত কেশ অর্থাৎ, খোলা চুল, কারা মুক্ত অর্থাৎ, কয়েদ হতে খালাস প্রাপ্ত, মুক্তছন্দ অর্থাৎ, যে কবিতায় কোন বাধাঁধরা নিয়ম নেই ইত্যাদি। সুতরাং মুক্তমনে

এবং মুক্ত বুদ্ধি নিয়ে কুরআন ও হাদীছ অধ্যয়নের অর্থ হবে যে এবং যে বুদ্ধিতে পর্ব ধারণার কোন বাঁধা-বন্ধন থাকবে না, কোন বদ্ধমল চিন্দাধারা মনকে আছন্ন করে রাখবে না- এমন একটা স্ব ছ ও পবিত্র মন নিয়ে কুরআন ও হাদীছকে অধ্যয়ন করতে হবে। কথাটার ভুল ধরার সাধ্য কার ? বরং এমনটিইতো হওয়া উচিৎ। একটা পর্ব ধারণা, কিংবা বদ্ধমল কোন চিন্দা যদি পর্ব থেকেই মনকে আ ছন্ন করে রাখে, তাহলে কুরআন হাদীছের সত্যিকার আবেদন উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে তাইতো স্বাভাবিক। "দরূ মাআল কুরআনি হাইছু দ্বারা " (কুরআন যেমন আবর্তন করে, তুমিও তেমনি আবর্তিত হও)-এইতো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মর্মোদ্ধারের স্বতঃসিদ্ধ নীতি। মুক্তমনে (খালিউয যেহ্নে) কুরআন ও হাদীছ পাঠ করতে হবে । কোন পর্ব ধারণা মনে রাখা এবং সে অনুযায়ী তার ব্যাখ্যাতো রীতিমত তাফসীর -বির-রায় বা অপব্যাখ্যা এবং তা কুরআন সুন্নাহ অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যার মলনীতি পরিপন্থী । যার সম্ কর্কে হাদীছে সতর্ক বাণী এসেছে খব শক্ত ভাষায় এবং যুগ যুগ ধরে যে কাজটি করে আসছে বাতিলরা।

কিন্তু বেশ কিছু দিন যাবত এ শব্দটার মধ্যে "ইনিল হুক্মু ইলণ্ডা লিলণ্ডাহ"-এর খারেজী শেণ্ডাগানের মত একটা কিছু ইনকারের গন্ধ পাওয়া যা ছে। মুক্ত বুদ্ধির দোহাই দিয়ে এক শ্রেণীর লোক পর্ব সরীদের কৃত কুরআন ্ও সুন্নাহর সকল ব্যাখ্যা এবং সে ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যা ছেন এবং ইমাম ও মুজতাহিদগণ কর্তৃক কুরআন ও হাদীছ থেকে দীর্ঘ দিনের গবেষণা লব্ধ ফিকাহ্ শাস্কে তারা অস্বীকার করতে চা ছেন। মুক্ত মনেই তারা কুরআন ্ও হাদীছ থেকে সব কিছু অনুধাবন করতে চাইছেন আর তাই পর্ব থেকে কে কি বলে আসছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহর কে কি ব্যাখ্যা ও তরজমানী করে আসছেন তার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজের বুদ্ধির গতিশীলতা প্রদর্শন করছেন । কিন্তু তার এই মুক্তবুদ্ধিটা শেষ পর্যন্ বুদ্ধির স্বে ছাচারিতা হয়ে দাঁড়া ছে কিনা তাওতো একবার তলিয়ে দেখার দরকার আছে। ইসলামী চিন্দাধারায় গতিশীলতার নীতি অর্থাৎ, ইজতিহাদের ব্যবস্থা রয়েছে সত্য; কিন্তু তার জন্য কি কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই ? মনের উপর শয়তানের প্রভাব এবং কুরআন ও হাদীছ অধ্যয়ন ও মর্মোদ্ধারের

শয়তানের পক্ষ থেকে প্রক্ষেপন হ ছে কিনা তার খোঁজ রাখবে কে? তার থেকে মনকে মুক্ত রাখাতো চাট্টিখানি কথা নয়। তাহলে কিন্তু মুক্তমন যাকে বলে ষোল আনায় তা করোর ক্ষেত্রেই পাওয়া যা ছে না, এর পরও রয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের র চির বিভিন্নতার প্রশ্ন। তদুপরি মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির অর্থ কি বুদ্ধির বল্গাহীনতা ? এই মন ও বুদ্ধিকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্যেও কি থাকবে না কোন নিয়ম নীতির বন্ধন ?

আলণ্ঢাহর হুকুম কুরআন এবং তার ব্যাখ্যা রাসল (সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম) এর হাদীছে এসেছে । এখন কেউ যদি এরূপ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী হন যে, সরাসরি কুরআন ও হাদীছ থেকে মাসআলা চয়ন করে আমল করতে সক্ষম, তবে তিনি তা করতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, প্রতিটি ব্যক্তিই কি সরাসরি কুরআন ও হাদীছ থেকে বিধি-নিষেধ বুঝবার যোগ্যতা রাখেন? নিশ্চয়ই রাখেন না। খুব কম সংখ্যক লোকই সে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। বলা বাহুল্য, যেনতেনভাবে আরবী ভাষা বুঝতে সক্ষম বা শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় তরজমা ও তাফসীর পাঠই যার সর্ব সাকুল্য মলধন, এমন কেউ যদি ইজতিহাদের পথে অগ্রসর হতে চান, তাহলে তিনি যে পদে পদে ভুল করে বসতে পারেন তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। ইজতিহাদ বা কুরআন ও হাদীছের আলোকে গভীর সাধনার মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান দেয়ার অধিকার এমন ব্যক্তিরই আছে যিনি শরীয়তের পর্ণ অনুসরন, তাফসীর ও হাদীছ শাস্ত্রের পরিপক্ক জ্ঞান এবং কুরআন ও হাদীছের ভাষা- আরবী ও তার সাথে সংশিণ্ঢষ্ট বিদ্যার উপর অগাধ দখল রাখেন; উপরন্ত যার তাকওয়া, বুযর্গী ও নিষ্ঠার ব্যাপারে সমকালীন আলেমগণ পর্ণ আস্থা পোষণ করেন। এহেন যোগ্যতা রাখেন না- এরূপ কোন ব্যক্তি যদি ইজতিহাদ শুর করেন এবং শুদ্ধ মাসআলাও বলেন, তবুও তিনি কঠিন গোনাহগার হবেন। কারণ, তিনি অনধিকার চর্চা করেছেন এবং তার পক্ষে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে তা বলছিনা, বরং নিত্য নতুন সৃষ্ট সমস্যা যার সমাধান ইতিপর্বে কখনো হয়নি সেক্ষেত্রে তো ইজতিহাদ বৈ গত্যন্তর নেই। কিন্তু তাই বলে মুক্তবুদ্ধির শেণ্ঢাগান দিয়ে চুনোপুটি নির্বিশেষে যারা সর্বজন স্বীকৃত প্রজ্ঞাবান ও মহামতি

ইমামদের সাথে জ্ঞান প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার খায়েশ মনে ¢
করেন তাদের সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কতটুকু গভীর তা যদি ফেকাহর ইমামগণের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে মিলিয়ে কিছুটা পরখ করে নেন তাহলে বুঝে আসবে যে, নিজে নিজে মাসআলা চয়ন না করে যে কোন একজন ইমামের তাকলীদ করা কতটুকু নিরাপদ। সত্যিকার বলতে কি এটাই নিরাপদ রাস্া। অবশ্য যদি কেউ আগে থেকেই নিজের মন মস্তিষ্ককে বিদ্বিষ্ট করে রাখেন তবে তার কথা অবশ্যই আলাদা।

রাসল (সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম) নিজে কথা, কাজ, সমর্থন ও আদর্শের মধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে কুরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম শিক্ষা দিয়েছেন তাদের পরবর্তিদেরকে, আর এভাবেই চলে আসছে কুরআন ও সুন্নাহ অনুধাবন এবং তার ব্যাখ্যার নিশ্চিত সত্য ধারা। আর হক ও হক্কানিয়াতের এই যে অবি ছিন্ন সত্র পরম্ রা এরই লাগাম লাগিয়ে চালাতে হবে বুদ্ধিকে; অন্যথায় তথাকথিত 'মুক্তবুদ্ধির' লাগামহীন-অশ্ব বুদ্ধিবৃত্তির সীরাতে মুস্তাকীম হতে বি ছিন্ন হয়ে কোথায় কোন্ জঙ্গলে যে কত রকম বন্য বরাহের শিকার হবে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

ফ্রি মাইন্ড

মুক্তমন কথাটার প্রয়োগ দেখা যায় আরও একটা ক্ষেত্রে। আজকালকার আধুনিক ও আধুনিকারা শব্দটার সাহায্যে বেশ রকম একটা শুভংকরের ফাঁকি দিয়ে থাকে । শব্দটার ইংরেজী তরজমা 'ফ্রি মাইন্ড'-ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। বলা বাহুল্য, ব্যবহারিক জীবনে এই 'ফ্রিমাইন্ড' বা 'মুক্তমন' এর গুর ত্বটা অপরিসীম। একের প্রতি অন্যের কুধারণা থাকবে না ; কলুষতা ও আবিলতা মুক্ত অকপট বিশ্বাসে ভরা থাকবে মন, সহজ সরল হৃদয়ে একে অপরের কথা, কাজ ও আচরণকে গ্রহণ করবে, একে অপরের সান্নিধ্যে আসবে শঠতা, ভাড়ামি বা বর্ণচোরা মনোবৃত্তি মুক্ত হয়েই। এতো একটা হৃদ্যতাপর্ণ, আন্তরিক ও মধুর ব্যবহারিক জীবনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য। তাইতো কুরআনে কারীম কোন কোন অনুমান বা কুধারণাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করেছে। এই যে মনের অনাবিল স্ব ছতা, এরই অধিকারীকে বলা হবে 'ফ্রি মাইন্ড' বা মুক্তমন এর অধিকারী। অভিধানের আলোকেও

তার অর্থ হওয়া উচিৎ। কথাটি এ অর্থে কতইনা সত্য। কিন্তু ইদানিং এর মতলবটা খারাপ নেয়া হচ্ছে - তথাকথিত ফ্রিমাইন্ড ও মুক্তমন এর প্রবক্তা আধুনিক ও আধুনিকারা ফ্রি মাইন্ড কথাটিকে 'ফ্রি সেক্স' অর্থে গ্রহণ করছে। নৈতিক অনুশাসন থেকে যতক্ষণ না কেউ মুক্ত হতে পারছে ততক্ষণ যেন তাদের মানদন্ডে সে মুক্তমন এর অধিকারী সাব্যস্ হতে পারছে না । রমনা পার্কের নিভৃত বৃক্ষের ছায়ায় ভানু মতির খেলা এবং ক্রিসেন্ট লেকের পাড়ে মৃদুমন্দ হাওয়ায় দু'জনে দু'জনার হয়ে যাওয়া এটাই হল বিলক্ষণ ফ্রি মাইন্ড। ভোগের আগে প্রেম প্রেম নিবেদন আর তারপর কলার ছোবড়ার ন্যায় কদরহীনভাবে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ পর্যন্ সবই নাকি মুক্তমনেই (?) হয়ে থাকে। ফ্রি সেক্স নীতির যে কোন অনুশীলনকে বৈধ করে নেয়া হয় এই ফ্রি মাইন্ড বা মুক্তমন কথাটার দোহাই দিয়ে। যে কোন অবাধ যৌনচারিতার বিপক্ষে আপনি নৈতিকতার কথা বলবেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে বদ্ধ-মনসিকতার অধিকারী ঠাওরানো হবে। একটু পর্দা-টর্দার কথা বলা অথবা নারী-পুরষের অবাধ মেলামেশা কিংবা যৌন উদ্দীপক চটুলতায় লজ্জাভাব পোষণ করা সব নাকি মুক্ত মনের পরিপন্থী। মনের দুয়ার মুক্ত করে দিতে হবে, যেন সেই অবারিত দুয়ার দিয়ে অবাধে প্রবেশ করতে পারে যে কেউ, তা সেটা সাপ বিছু বা কালকেউটেই হোকনা কেন । আর দু'দিন পর সেই কালকেউটের দংশনে স্ফীত হয়ে উঠুক না মেদবহুল তলদেশ, তবুও থাকবে না কোন বাঁধা-বন্ধন। অবাধ যৌন চাহিদা মিটানোর মোক্ষম যুক্তি বটে! ফ্রয়েড বেঁচে থাকলে তার আদর্শের পক্ষে নিবেদিত প্রাণদের এই যুক্তি উদ্ভবনের জন্য নিশ্চয়ই তিনি এদেরকে পুরস্কৃত করতেন।

চিত্ত বিনোদন

আবার এ সমস্ কান্ড কারখানাকে তাথাকথিত মুক্তমন ওয়ালারা কখনো কখনো ভিন্ন আঙ্গিকেও ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। কলিকালের এই সব আচরণকে তারা চিত্তবিনোদন বলে চালিয়ে দেন। এই 'চিত্তবিনোদন' ও এমন একটা কথা যা আভিধানিক অর্থে সত্য (গ্রহণযোগ্য), কিন্তু তার মতলব নেয়া হয় খারাপ। অভিধানে দেখতে পাই 'চিত্ত' অর্থ মন,

হৃদয়, অন্তঃকরণ। আর 'বিনোদন' অর্থ প্রফুলণ্ঢতা বিধান, আনন্দ
তুষ্টি সাধন। অতএব মুক্তভাবে চিত্ত বিনোদন কথাটার অর্থ হল মানসিক প্রফুলণ্ঢতা বিধান, মনকে আনন্দ দান, মনের তুষ্টি সাধন। সংক্ষেপে এই ধরন-একটু ফুর্তি ফার্তি উপভোগ আর কি! কথাটার অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করার সাধ্য কার ? এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নিরবচ্ছিন্নভাবে মানুষ যেমন হাসতে পারে না, তেমনি চব্বিশ ঘন্টা লাগাতার কাঁদতেও পারে না, উভয়েরই সমন্বয় থাকতে হয় জীবনে। দুঃখ-কষ্ট, পরিশ্রম ও সাধনার নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মাঝে তাই থাকতে হয় সুখের একটু অনুভূতি, জীবনে মাঝে মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে হয়, হাসতে হয়, বুকটা হাল্কা করতে হয়, একটু আনন্দ-ফুর্তি করতে হয়, একটু সুখ ও সৌন্দর্য উপভোগ করতে হয়। জীবনের জ্বালা যখন দীর্ঘায়িত হতে থাকে তখনই প্রয়োজন হয় একটু শান্তির, একটু স্বস্তির ও একটু মায়া মমতার। আর দুঃখের মাঝে এই যে সুখের অনুভূতি, কষ্ট সাধনার মাঝে এই যে একটু হাসি, একটু স্বস্তি আর পারস্পরিক মায়া-মমতা এইতো বিনোদন। এর প্রয়োজনীয়তা বদ্ধ পাগলও বোধ করি অস্বীকার করবে না কিংবা কোন মহান সাধকের ব্রতও বিঘ্নিত হবে না এতে, হওয়ার কথাও নয়। স্বয়ং রসলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢামওতো চিত্ত বিনোদন করতেন তার উজ্জ্বল অধরে হাসির রেখা টেনে কিংবা বিভিন্ন হাস্য রসিকতার মাধ্যমে। তাঁর অনেক কৌতুকের কথাও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে । যদিও তাঁর চিত্ত বিনোদনের স্বরূপ ছিল আমাদের থেকে ভিন্নতর - যেখানে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হতনা, কিংবা ঈমান আকীদার সীমানা লংঘন করা হতনা, সে চিত্ত বিনোদনের ছিল একটা চৌহদ্দি। আর এই হল বৈধ চিত্ত বিনোদন। কিন্তু হালে চিত্ত বিনোদনকে যে অর্থে গ্রহণ করা হচ্ছে তার কোন চৌহদ্দি নেই। সব ধরনের ফুর্তি-ফার্তিকেই চিত্ত বিনোদন বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। মক্ষিরাণীদের মাতাল করা প্রলয় নৃত্য আর গুরুদেবের আশ্রমে ভাং খেয়ে বুদ হয়ে পড়ে থাকা সবই এর আওতাভুক্ত। চিত্ত বিনোদনের মাতাল অশ্ব আলো ঝলমল রাজপথ আর সর অন্ধগলি সর্বত্রই চলে থাকে

কিন্তু কথা হল, এই ফুর্তি-ফার্তির ধরণটা কি হওয়া উচিত, চিত্ত বিনোদনের সঠিক চৌহদ্দি কি হবে ? যা কিছু আনন্দ দেয় তার

|ই কি চিত্তবিনোদন বলে গন্য হবে, আর তা উন্নত সমাজ গঠনের মডেল হিসেবে আখ্যায়িত হবে ? কেউ তো আকণ্ঠ মদ পানে আনন্দ পায়, কেউ কলেজ থেকে ফেরার পথে সেয়ানা-সোমত্ত মেয়েদেরকে অপহরণ করে সর্বস্ব লুটে নিয়ে আনন্দ পায়। আবার কেউ দান করেও আনন্দ পায়, নানান রকম সমাজ সেবামূলক কাজ করেও কেউ আনন্দ পায়। আবার কেউ মুগ্ধ নয়নে প্রকৃতির সবুজ শ্যামল রূপ হেরে কিংবা পড়ন্ত বেলায় সাগর তীরে দাঁড়িয়ে সর্য ডোবার দৃশ্য দেখেও আনন্দ পায়। 'নানা মুনির নানা মত' -এর ন্যায় এই আনন্দ বোধেরও রয়েছে নানান ধরণ, ব্যক্তির রূচি ও মন-মনসিকতার বিভিন্নতার ফলে। যে চিত্ত যেমন তার চাহিদাও তেমন। শয়তানের চিত্তের দাবি আর সাধুর মনের চাহিদা আদৌ এক হবে না। তাই এই চিত্ত বিনোদনের নির্ধারিত রূপ বা ষ্ট্যান্ডার্ড চিত্ত বিনোদন বলে কোন ধারনা আছে বলে মনে হয় না। চিত্ত বিনোদনের যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় সব যদি বৈধ হয়ে যাবে আর দোষের না হবে, তাহলে মাস্তানদের চিত্তবিনোদনের শিকার হয়ে যখন আপনাদের (অবাধ চিত্তবিনোদনবাদীদের সম্বোধন করে বলছি) মা, মেয়ে, স্ত্রী কিংবা বোন, ভাগ্নী নাজেহাল হয়, তখন কেন নারী অপহরণ কিংবা প্রতারণার অভিযোগ তোলেন ? পরের মেয়েকে নিয়ে ফষ্টি-নষ্টি নিজের বেলায় চিত্ত বিনোদন হতে পারলে অন্যের বেলায় কেন সেটাকে রোমান্টিসিজম বলে মেনে নেয়া যায় না ? কেউ যদি গলা ছেড়ে দিয়ে আপনাকে গালি দিয়ে চিত্ত সুখ অনুভব করে তাহলে কেন আপনার চিত্তজ্বালা শুরু হয় ? কিংবা ফ্রি ষ্টাইলে দিন দুপুরে কেউ ছিনতাই করে চিত্ত বিনোদনের স্বাশ্রয় করতে গেলে কেন আপনি তার বিরুদ্ধে থানায় আশ্রয় খোঁজেন ? যোড়ষী তন্বীদের টিকা-টিপ্পনী কেটে কেউ যদি চিত্ত বিনোদন করে, তাহলে তাকে বখাটে বলে গালি দেয়া হয় কেন ? আপনার বিচারে এই তারতম্য কেন? আপনি কিসের মানদন্ডে বিচার করেন ? আপনার বিচারটা ঠিক হচ্ছে না ! কারণ-ভোগের নিু চাপ ঘনিভূত হওয়ার ফলে মস্তিষ্কেরস্নায়ু উষ্ণ থাকলে সেখান থেকে সঠিক বিচার বের হয় না, তার জন্য তো ঠান্ডা মস্তিষ্ক চাই। চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাবী, চোরাচালানী, কালোবাজারী, বাটপাড়ী, ঠকবাজী করেও অনেকে আনন্দ পায়, তাহলে কি চিত্ত বিনোদন হিসেবে এগুলোও উন্নত

সোসাইটি গঠনের মডেল বলে নন্দিত হবে ? তাহলে কেন এই জরিমানা কিংবা টাক্স ফোর্স গঠন, কেন এই গোয়েন্দা সংস্থা কিংবা দর্নীতি দমন ব্যরোর প্রয়োজনীয়তা ? আর কেনইবা এ সবের পেছনে এতসব অর্থের অপচয় ? এই অবাধ চিত্ত বিনোদনের পক্ষে যেসব আক্কেলমন্দরা উকালতী করেন-তাদের পক্ষ থেকে দেশবাসী এর জবাব প্রত্যাশা করতে পারেন। একজনের চিত্ত বিনোদনে আর একজনের চিত্ত জ্বালা সৃষ্টি হলে সেই চিত্তবিনোদন কিভাবে বৈধ হয়, দেশবাসী তার দার্শনিক ব্যাখ্যা আশা করতে পারেন সেইসব তথাকথিত ফ্রী ষ্টাইল চিত্ত বিনোদনবাদী সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। চিত্তবিনোদনের একটা স্ ষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন সংজ্ঞা দিতে হবে, যা নিজের এবং অপরের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। অন্যের মেয়েকে ফুসলিয়ে-ফাসলিয়ে লেকের পাড়ে নিয়ে কাটাতারের বেড়া ডিঙ্গানোকে চিত্ত বিনোদন বলে আখ্যায়িত করলে নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে সেটাকে সর্বনাশ বলে ছিঁচকাঁদুনী কাঁদতে পারবেন না। এক ক্ষেত্রে প্রেমের গুনগুনানী আর অন্য ক্ষেত্রে প্যানপ্যানানী করবেন এরূপ বৈষম্যমলক ও স্ব-বিরোধী আচরণ বিংশ শতাব্দীর সচেতন নাগরিক মেনে নিবে না বরং আজকের যুগে আপনি কারও ক্ষেতে ঘুঘু চড়াবেন তো সে আপনার ক্ষেতে শিয়াল কুকুর চড়িয়ে তবে ক্ষান্ হবে। আপনার জায়া-কন্যারা যদি বিনোদনমলক প্রেক্ষাগৃহে অন্যের হাত ধরে ঢলাঢলি করতে করতে যায়, আর সৌভাগ্য (!) বশতঃ একে অপরের আইল ঠেলে অন্যের ভূমিতে পানি সেচন করে কিংবা অবিবাহিত যুগলরা বিনোদনমলক একত্র যাপনের ফলে চিত্ত সুখের ফলাফল প্রকাশ করে, তাহলে কিন্তু আপনি তাকে কুলটা বা জাতমান খোয়া বলে চিত্ত জ্বালা প্রকাশ করতে পারবেন না। চিত্তসুখের ফল কেন চিত্ত জ্বালায় প্রকাশিত হবে ?

প্রগতি, যুগের হাওয়া ও যুগধর্ম

অবশ্য আজকাল অনেকে আবার এগুলিকে 'প্রগতি' (?) বলে আখ্যায়িত করেন। এই 'প্রগতি'ও এমন একটা শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ গ্রহণযোগ্য হলেও তার মতলব নেয়া হয় খারাপ। আভিধানে দেখতে পাই 'গতি' শব্দের অর্থ-যাত্রা, গমন, চলন, বেগ ইত্যাদি। আর তার

'প্র' উপসর্গ যোগ হয়ে (যা গতি, খ্যাতি, নিরবচ্ছিন্নতা পশ্চাদগামিতা, প্রকৃষ্ঠতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়) সৃষ্টি হয়েছে 'প্রগতি'। অবশেষে জোড়াতালির পর এই শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছে অগ্রগতি, উন্নতি, যে গতি অন্যের পশ্চাদানুসরণ করে চলে অর্থাৎ, পরিবর্তনশীল জগতের সাথে সমান তালে পা ফেলে চলা, আধুনিক রীতি-নীতির যথেচ্ছা প্রবর্তন ইত্যাদি । আভিধানিক অর্থে এই প্রগতির প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। জীবন প্রবাহে যদি স্রোত না থাকে , তাহলে বদ্ধ জলাশয়ের পানির ন্যায় শৈবাল দাম ঘিরে পচন ধরবে তাতে। পরিবেশ পরিস্থিতি যুগ ও প্রেক্ষিতের পরিবর্তনই গতিশীলতাকে অনিবার্য করে তোলে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে চাহিদার বিভিন্নতা ঘটা একটা প্রাকৃতিক বিধান। মানব জীবনের সমাজ-সামাজিকতা, রূচি ও মনের ক্ষেত্রে এই যে গতিশীলতা ও বেগময়তা ; এই অর্থে যদি ব্যবহৃত হয় 'প্রগতি' তাহলে তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ইসলামেও এরূপ গতিশীলতার নীতি স্বীকৃত এবং উৎসাহিত হয়েছে।

চিন্তাধারা ও মনের ক্ষেত্রে ইসলাম যে গতিশীলতার নীতি প্রবর্তন করেছে, পরিভাষায় তাকে বলা হয় 'ইজতিহাদ' অর্থাৎ, নিত্য নতুন সৃষ্ট সমস্যা, যার সমাধান ইতিপর্বে কখনও হয়নি, সেক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীছের আলোকে গভীর সাধনার মাধ্যমে সমাধান বের করা। মল নীতিধারার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে যুগের চাহিদা ও প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে ইসলামের উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা প্রদানের বিষয়টিও শরীয়তে নন্দিত।

আর সমাজ-সামাজিকতা ও বৈষয়িক জীবনের বিষয়াবলীকে ইসলাম স্থান, কাল ও পাত্রের উপর ছেড়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে ঈমান-আকীদা ও নিজস্ব তাহ্জীব বা তামাদ্দুনের সীমানায় থেকে বৈচিত্র বিধান করা ইসলামে অবৈধ নয় অর্থাৎ ; তা আদর্শিক কাঠামো ও স্বকীয়তা পরিত্যাগ করেনা। কিন্তু হালে প্রগতির নামে যে গড্ডালিকা প্রবাহ চলছে, এই প্রগতির দোহাই পেড়ে যে বেহায়া বেলেলণ্ঢাপনা ও নগ্নতার কসরত দেখানো হচ্ছে তা কখনো বৈধ প্রগতির সীমায় থাকছে না। একে প্রগতি না বলে নির্ঘাত অধঃগতি বলাই সমীচীন হবে। 'গতি'র সাথে 'প্র'

উপসর্গ যোগ হয়ে গড়ে উঠেছে এমন একটা জীবন দর্শন, যা আদর্শ বর্জিত ও লাগামহীন। আর তার সাথে বাদি বা বাদিনী যোগ হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে এমন এক আজব চিড়িয়া যে চিড়িয়া গতির সাথে 'প্র' উপসর্গের পুচ্ছ লাগিয়ে অলি-গলিতে, ক্লাবে, পার্কে, আর সিনেমা টেলিভিশনে নগ্ন অর্ধনগ্ন অবস্থায় ধেই ধেই করে নাচে; কিংবা পাতলা ফিনফিনে শাড়ী পরে, পেটের মেদবহুল তলদেশ উন্মুক্ত করে, হাতকাটা বণ্ঢাউজ পরিধান করে রাস্তায় রাস্তায় ও হাটে বাজারে রূপের বিজ্ঞাপনে বের হয়, আর নারী-পুরষের ও পুরষ-নারীর বেশ ধরে রচির গতিশীলতা প্রদর্শন করে। আর তাই সেই নাচে (কিন্তু 'কাকের ময়র নাচ') নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাহজীব-তামাদ্দুন ও রচি বলতে তাদের কিছু নেই। তারা পাশ্চাত্য ধর্মহীন কৃষ্টি-কালচারের সন্ধান পেলেই শুর করে নিষ্ঠার সাথে তার অনুশীলনের কসরৎ। নিজস্ব আবিস্কার উদ্ভাবনের কোন শক্তি নেই তাদের। ওরা ক্ষুধার্ত শকুন-শকুনীর মত চেয়ে থাকে পাশ্চাত্যের দিকে ; যেই দেখতে পায় প্রগতি (?)-র কোন নতুন মড়ক, অমনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার উপর। আর চোখ কান বুঁজে অতৃপ্তি সহকারে গোগ্রাসে গিলতে থাকে সেটা। ভাব খানা যেন-আহা মরি কি স্বাদ! কি অপর্ব!! এই যে হালের প্রগতি; তার কোন নির্ধারিত গতি বা দিক নেই কিংবা কোথায় এর শেষ তাও জানা নেই কারো। কারণ ওরাই বলে থাকে যুগের হাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, তা সে হাওয়া যে দিকেই প্রবাহিত হোক না কেন। প্রগতির ডানা মেলে সে হাওয়ায় উড়তে থাকতে হবে। কোন ডাস্টবিন বা পঁচা নর্দমায় নিয়েও যদি ফেলে দেয় সে হাওয়া, কোন আপত্তি নেই তাতে। 'তথাস্থ গুর' বলে দু'চার ঢোক গিলে নিতেই হবে। অন্যথায় যে প্রগতিশীল (?) হওয়া যাবেনা। প্রগতিশীল হওয়ার জন্য মোলণ্ঢা-মৌলভীকে ওরা ধর্মান্ধ, কুসংস্কারা ছন্ন, কূপমন্ডুক ইত্যাদি গালি দেয়, অথচ প্রগতির নামে যে কোন কিছুর অন্ধ অনুকরনে পারদর্শী ওরা। তা তোমরা খুব প্রগতিশীল হও, অন্ধ অনুকরণে পাক্কা উস্াদ হও, বাঁদরের স্বভাব যেমন অনুকরণ প্রিয়তা তেমনি অনুকরণ প্রিয় হও, স্বজাতির স্বভাব ভুললে চলবে কেন ? তোমরা তো ডারউইনের শিষ্য! তোমরা আবার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ না,

ডারউইন যাদের গুর নয় তাদের কাছেই বিনা পারিশ্রমিকে তোমাদের য় পাবলিসিটি করছি।

এক ধরনের প্রগতিবাদী আছে, যারা প্রয়োজনে যে কোন রূপ ধরতে পারে। একেবারে 'বাহাত্তুরে ধরা' চোরের দলে মিশে চুরি করা, ডাকাতের দলে মিশে লুটতরাজ করা, আবার মুসলিণ্ঢর দলে মিশে মসজিদে মাথা ঠোকানো এবং যিকিরের হাল্কায় বসে মাথা ক্বলব জারীর কসরৎ সবই করে থাকে ওরা। সাধু আর শয়তান সব দলেরই পাক্কা শিষ্য সাজতে পারে ওরা। কারণ সব তালে তাল মিলানোই হল যুগের হাওয়া । 'বর্ণচোরা আম'-এর ন্যায় ওদের স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন। রাজনীতির মঞ্চে দর্নীতির বির দ্ধে গরম গরম বক্তিমা ঝাড়া, আবার চোরাচালানীর নেতা সেজে কলকাঠি নাড়ানো সবটাতেই সিদ্ধহস্ ওরা। সবটাই নাকি যুগের হাওয়া। যখন যেদিকের হাওয়া আসে সেদিকে জীবন তরীর পাল খাটাও, তা সে হাওয়া অভিষ্ট মন্যিলে মকসদের প্রতিকূলেই বয়ে চলুক না কেন। আর জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্যই বা কি ছাই! খাও দাও, ফুর্তি কর- এইতো সার কথা। সুতরাং গাঙের পানি   যে দিকেই চলে ঢেউয়ের তালে তালে সে দিকেই নেচে নেচে চল, দেখবে চলতে কোন শক্তির প্রয়োজন হবেনা, ছন্দে ছন্দে জীবন তরী আন্দোলিত হতে থাকবে। আর এর বিপরীত চলতে গেলে তো আদর্শিক শক্তির প্রয়োজন হবে। তাই আদর্শ আর স্বকীয়তার চিন্া পরিত্যাগ করে যুগ ধর্মকে দ'ু বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন কর। যুগ হাওয়া যে দিকেই ধাক্কা দেয় সে দিকেই বৈঠা বেয়ে চলো। প্রচুর ফায়দা লুটতে পারবে, জীবনে রোমাঞ্চের পরশ লাগবে। কেউ অর্ধ নগ্ন হয়ে নেচে হাততালি কুড়াতে সক্ষম হলে তুমি দর্শকের তালে তাল মিলিয়ে বস্ের জঞ্জাল মুক্ত হয়ে নাচ দেখাও; দেখবে সেই অতি প্রগতিশীল (?) নাচ দেখে দর্শকরা আসন ছেড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবে। নাচ, গান, বাজনা, রেডিও, টেলিভিশন এসবের কথা বলে আর পুরানো কাসুন্দি না হয় নাই ঘাটলাম; ফ্রি সেক্স, ভিডিও, ভিসিআর, লোনের টাকায় বড় বড় রকমারী দালান কোঠা তৈরি করা, বীমা, প্রাইজ বন্ড, লটারী ইত্যাদি যত ধরনের সদী কারবারসহ যুগের যত হাওয়া চালু হয়েছে, নিষ্ঠার সাথে এই হাওয়ায় পাল খাটাও, এ যে যুগের দাবী! নইলে প্রগতিশীল হওয়া যাবে

না, হাজার হাজার নতুন ডিজাইনের দালান কোঠা গড়ে উঠবে না. কসমেটিকের বাজার গরম হবে না, জীবনে কোন রোমান্স থাকবে আর এর বিরুদ্ধে সেকেলে (?) আলেম মৌলভীরা যতই লক্ষিন্দরের কি ছা শোনাক খবরদার! কাকস্য পরিবেদন- মোটেই কান দেবেনা সে দিকে! ‘প্রগতি’ ‘যুগের হাওয়া’ ‘যুগধর্ম’ এই ত্রিত্ববাদকে যক্ষের ধনের ন্যায় বুকে আগলে রাখবে, পরিত্রাণ(?) পাবে। নারী পর্দার বন্দীশালা (?) থেকে পরিত্রাণ পাবে, বারাঙ্গনা পতিতালয়ের প্রাচীর ভেঙে মুক্ত হাওয়ায় বেরিয়ে গোপনীয়তার ঝঞ্ঝাট থেকে পরিত্রাণ পাবে। আর আদর্শের সব বাঁধা-বন্ধন থেকে পরিত্রাণ পাবে পুরুষ দল। আর এই ত্রিত্ববাদকে পরিত্যাগ করলে জীবন নরকময় হয়ে উঠবে, রঙে রসে আর ভরে উঠবেনা জীবন, আকাশ কুসুম কল্পনা বাদ দিতে হবে। ইবাদত-বন্দেগী, পর্দা-পুশীদা আর হালাল-হারামের মধ্যযুগীয় শৃখলে জীবনটা তখন শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে উঠবে। আদর্শ, সত্য, ন্যায়-নীতি, ইনসাফ, ভদ্রতা ইত্যাদি যতসব বস্তাপঁচা ব্যাপার-স্যাপারে জীবনটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠবে আর কি।

নিজস্ব গতিতে না চলে তার সাথে ‘প্র’ উপসর্গ যোগ করার ফলেই যতসব উপসর্গ সৃষ্টি হয়েছে। আসলে এই ‘প্র’ উপসর্গই যত অনাসৃষ্টির মল। এই ‘প্র’ উপসর্গ ন্যায়কে অন্যায় (অ+ন্যায়=অন্যায়) আর ভদ্রকে অভদ্র (অ+ভদ্র=অভদ্র) বানিয়ে ফেলে। শ্রীকে বিশ্রী (বি+শ্রী=বিশ্রী) আর রূপ রসকে অরূপ ও নিরস করার মত অকান্ডটা ঘটায়। আর তাতো ঘটাবেই, উপসর্গ উপসর্গই (রোগ-ব্যাধি) সৃষ্টি করে থাকে। তেতুলের বিচি বুনে মিষ্টি আমের আশা করা বাতুলতা নয় তো কি ? সুতরাং এ উপসর্গ থেকে বাঁচতে হলে অভিধানের উপসর্গ অভিধানেই রাখুন, জীবনের অঙ্গনে টেনে আনা বোধ হয় ঠিক হবে না।

নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতা

অনেকে আবার ইংরেজী অভিধান খুলে চমৎকার একটা শব্দ খুঁজে পেয়েছেন। শব্দটা হল ‘আলট্রা মডার্ণ’ (অত্যাধুনিক বা অতি প্রগতি) তা শব্দ যাই হোক দু’দিনের যোগী হয়ে ভাতকে অন্ন বলুন কোন রকমফের হবেনা তাতে, উভয়েরই উপাদান এক। প্রগতি বলুন আর

আল্ট্রা মডার্ণই বলুন, বাস্তবে সেটা অধঃগতি বা উল্টো মডার্ণ কিনা

া ভেবে দেখতে সাধ জাগে। এই ‘প্রগতি’ বলে যে দর্শনটা দাঁড়
করানো হচ্ছে মুলতঃ তা ধর্মীয় আদর্শের পরিপন্থী , যা অকল্যাণেরই
সচনা ঘটায়। এ জন্যেইতো নারী প্রগতি এবং এর সমর্থকরা নারী মুক্তি
ও নারী স্বাধীনতার শেণ্ঢাগান দিয়ে নারী সমাজকে যে পথে ঠেলে দিচ্ছে
তা নারী সমাজের জন্য অকল্যাণই ডেকে আনছে। সত্যিকার অর্থে নারী
মুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং নারী স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার
করে কে ? নারীর মানবতার মুক্তি, নারীর সহজাত বৃত্তির বিকাশ সাধনের
সুব্যবস্থা এবং নারী জীবনের সবচেয়ে মল্যবান বস্তু-সতীত্ব রক্ষার
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিধান, সর্বোপরি পরকালের মুক্তির
মাধ্যমেই হতে পারে নারীর মুক্তি। আলণ্ঢাহর আইনে মাতৃজাতির
সতীত্বের মল্য সর্বোপরি রাখা হয়েছে। এরই প্রয়োজনে ১৬ বৎসরের
পর্বেও বিবাহের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে মাতৃ জাতিকে। আর মানব রচিত
আইনে এই স্বাধীনতাকে করা হয়েছে হরণ। নারীর মর্যাদা এতখানি যে,
তার গায়ে হাত তোলাতো বড় কথা, তার প্রতি কোন বেগানা পুরষ
নজর তুলে দেখুক তার জন্যও ইসলাম শাস্তি নির্ধারণ করেছে। তার
সহজাত বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধন ও তার অধিকার সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে
নারীর জন্য ভিন্ন কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে এবং পুরষের প্রতি
হারাম করা হয়েছে অন্য মহিলার সংসর্গ বা কোন উপপত্নী রাখাকে।
কিন্তু হালে যে মুক্তি ও যে স্বাধীনতার জন্য নারী সমাজ সোচার হয়ে
পথে পথে মিছিল, পণ্ঢ্যাকার্ড হাতে শেণ্ঢাগান ও সভা-সমিতির মঞ্চে
মিহি সুরে বক্তিমা ঝাড়ছেন তা কিন্তু সুস্থ বিবেক মেনে নিতে পারছে
না। কিংবা নারী মুক্তির আভিধানিক অর্থেও তা পাওয়া যাচ্ছেনা। নারী
মুক্তির মোহময় শেণ্ঢাগান দিয়ে বেহায়া বেলেলণ্ঢার মত রাস্তা-ঘাট আর
ক্লাব-পার্কে চলাফেরা তথা নিরাপত্তার আশ্রয় ছেড়ে কাম-কুক্কুট লোলুপ
দৃষ্টির অক্টোপাসে আবদ্ধ হয়ে মান-ইজ্জত গঙ্গায় বিসর্জন দেয়া হচ্ছে।
এখন নারী স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে নারীর সতীত্ব হরণের অবাধ অধিকার।
আধুনিকা নারীরা সভা-সমিতি ও সেমিনারে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ধুয়া
তুলছেন। কিন্তু যে পথ তারা বেছে নিচ্ছেন সে পথ কি তাদের মর্যাদা
রক্ষার পথ ? শোনা যায় তাদেরকেই চাকুরী রক্ষার স্বার্থে উপরস্দের

কাছে অনেক কিছু বিক্রি করতে হয়। মার্কিন সেনাবাহিনীর এ মুখপাত্র একবার উলেণ্ঢখ করেছিলেন যে, ইউরোপে অবস্থানরত মার্কিন সেনাবাহিনীতে বর্তমানে এক সহস্রধিক মহিলা সৈন্য রয়েছে। কিন্তু তাদের দায়িত্ব পালনে নানা বিঘ্ন ঘটে। এই বিঘ্নটা যে কোথায় তা কিন্তু সহজে অনুমেয়। প্রাইভেট সর্ভিসগুলোতে নাকি আরও জটিলতা-পার্টির মাধ্যমে কোম্ানীর বিভিন্ন এজেন্টদের মনোরঞ্জনের দায়িত্ব দেয়া হয় এই নারীর উপর। সত্যি বলতে কি নারী মুক্তির পক্ষে যে সব সাহেবরা ওকালাতী করেন সেই সব সাহেবরা যে নারীদেরকে ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাই বোধ হয় সেই সব সাহেবদেরকেও এই নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার স্বপক্ষে চুটিয়ে চুটিয়ে ওকালতী করতে দেখা যায়। ওরা তাই নারীদেরকে ক্লাবে নিয়ে যান, মাঠে নিয়ে ছুট ছুট খেলেন, সিনেমা বাইস্কোপে টেনে আনেন বা আরও যে কত রকম ফষ্টি-নষ্টির চোরাগলি আবিষ্কার করেন এবং করে চলেছেন তার হদ্দ ও হিসাব বোধ করি আদম শুমারী থেকেও কঠিন। ওরা কিন্তু খুবই স্বার্থপর ; নইলে গভীর রাতে যখন ক্লাব থেকে অন্য মেয়ের সাথে ফষ্টি-নষ্টি করে বাসায় ফিরে গিন্নিকে খুঁজে পান না তখন কেন চেঁচামেচি করেন ? এতসব বিড়ম্বনা আর আইল ঠেলে পয়মালী-ই যদি নারীর মুক্তি হবে, তাহলে যখন কসমেটিকের লেপ-প্রলেপ মেখে নানা বর্ণে সজ্জিত হয়ে ময়রের মত ছন্দে ছন্দে নাচতে বাইরে বের হয় আর দর্মুখেরা সুড়সুড়ি বোধ করে স্বে ছায় হোঁচট খেয়ে তাদের গায়ের উপর আছড়ে পড়ে, অথবা পাশে দাঁড়িয়ে জিহ্বা তালুর সাথে সংযোগ করে চাটনী খাওয়ার শব্দ তোলে তখন কেন পুলিশেরা তাদেরকে বখাটে আখ্যায়িত করে তাদেরকে ধরার অভিযান চালায় ?

এই নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতা ও নারী প্রগতির সনদ হিসেবে রেফারেন্স বুকের ন্যায় যে মার্কিন মুলণ্ঢুক, বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার হাওলা পেশ করা হয় সেসব দেশে নাকি এই নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার বদৌলতে এখন জারজ সন্ানেরা ঢাকার মশার মত গিজ গিজ করছে। একমাত্র ১৯৭৯ সালেই মার্কিন মুলণ্ঢুকে ৬ লাখ অবৈধ শিশু জন্ম নিয়েছে। শ্বেতাঙ্গ কুমারীদের এক তৃতীয়াংশ এবং কৃষ্ণাঙ্গ কুমারীদের শতকরা ৮৩ জনের অবৈধ সন্ান রয়েছে। এখন আশংকা

হচ্ছে কোটি ডলার পুরষ্কার ঘোষণা করলেও নাকি গোটা মার্কিন মুলণ্ডুকে ১৩ থেকে ১৬ বৎসরের একজন কুমারীও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। নারী স্বাধীনতার দ্বিতীয় স্বর্গরাজ্য হল ইংল্যান্ড। সেখানে ১৯৮০ সালে অনুর্ধ্ব ১৬ বৎসরের ৪ হাজার বালিকা গর্ভপাত করেছে। পাঁচজন নবজাতকের মধ্যে তিন জনই সেখানে কিশোরী মাতার সন্তান। আর প্রতি বছরই নাকি শতকরা ৫ ভাগ অবৈধ সন্তান বেড়ে চলেছে। আর এই যৌন কেলেংকারীর ব্যাপকতা আপন-পর সকলের মধ্যেই প্রসার লাভ করেছে। এমন ঘটনাও শোনা যায়-পিতা-পুত্র আর মা-কন্যা সবাই নাকি একই প্রবাহে লীন হয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সের অবস্থাও তথৈবচ। আর নারীদের ঘরের বাইরে কর্ম সংস্থানের পক্ষে সোভিয়েত রাশিয়ার যে মোক্ষম নমুনা পেশ করা হত স্বয়ং কম্যুনিষ্ট নেতা গরবাচেভ সাহেবই তা একবারে গজব করে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন নারীরা নাকি এতে করে তাদের নারীত্ব হারাতে বসেছে, গৃহই তাদের কর্মস্থান হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। তিনি সোভিয়েত নারীদের পারিবারিক পুনর্বাসনের আহ্বানও জানিয়েছেন। যাই হোক পৃথিবীর তাত্ত্বিক পরিসংখ্যান পেশ করার মত আন্তর্জাতিক বিদ্যা বুদ্ধি আমার নেই বললেই চলে। তবে এতটুকু বলা যায়- নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার নামে যে যৌন কেলেংকারীর হিড়িক চলছে এটাকে আর যাই হোক নারীর মুক্তি বা নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বলা যায়না। যেসব নামি দামি তুখোড় আক্কেল মন্দরা ভোগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টির জন্য নারী সমাজকে এই মুক্তি, প্রগতি ও স্বাধীনতার মিষ্টি গান ও অন্ধ সচেনতা সৃষ্টির প্রেরণা যোগাচ্ছেন, সত্য কথার আড়ালে নির্ঘাত তাদের মতলব খারাপ। এভাবে আন্দলোন করে মুক্তি লাভ বা মর্যাদা পনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। জাতিসংঘ ১৯৭৫-৮৫ ইং সালকে নারী নির্যাতন ও অবমল্যায়ন রোধে বিশ্ব নারী দশক বলে ঘোষণা দিয়েছিল। অথচ এ দশকেই নারী নির্যাতনের চিত্র দেখে বিবেকমান মানুষের টনক নড়ে গেছে। সত্য কথা বলতে কি মুক্তি, মর্যাদা ও স্বাধীনতার জন্য মুসলিম নারী সমাজকে আন্দোলন করতে হবেনা। তার ধর্মীয় মল্যবোধেই তার মর্যাদা ও মুক্তির রূপ নির্ধারিত ও নিশ্চিত রয়েছে। যে খৃষ্ট ধর্মে ও বাইবেলে নারীকে শয়তানের মাতা বলা হয়েছে, যে হিন্দু ধর্মের গীতা, রামায়ন ও

মহাভারতে নারী সমাজের মর্যাদা ও অধিকার সম্ কর্কে সামান্যতম উলেণ্ঢখ নেই। ডাস-ক্যাপিটাল নারী সমাজ সম্ কর্কে সম্ র্ণ নীরব, যার প্রতি বিশ্বাসী নারী সমাজ এখনও ডেইরী ফার্মের গর ছাগলের ন্যায় সন্ান প্রসব করে, যে ধর্মের রূপকানোয়াররা এই বিংশ শতাব্দীতে এসেও অগ্নিকুন্ডে ভষ্মীভত হয়, যে সব ধর্মে নারীদেরকে সম্ ত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, সে সব ধর্মের নারীরা তাদের মর্যাদা ও অধিকার আদায়ের জন্য যেভাবে হোক নর্তন-কুর্দন কর ক, আন্দোলন করে গোলণ্ঢায় যাক, তার অনুকরণ মুসলিম সমাজের নারীরা কখনো করতে পারেনা। পাশ্চাত্য সমাজকে এই তথাকথিত নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তির যে চরম খেসারত দিতে হ ছে তা দেখেশুনেও কেউ তার পেছনে অন্ধ হয়ে ছুটলে তাকে কর ণা করা ছাড়া কোন গত্যন্র দেখছিনা। পাশ্চাত্য সমাজ এই ‘নারী স্বাধীনতা’-এর ফল কি পেয়েছে তার একটি বিবরণ ‘অপসংস্কৃতির বিভীষিকা’ নামক একটি রম্য রচনা মলক বই থেকে পেশ করছি। তথাকথিত নারী স্বাধীনতা-এর অন্ধ মোহে আ ছন্নদের যদিবা হুশ ফিরে আসে।‘মার্কিন মুলণ্ঢুকে নারী স্বাধীনতা খুবই বেশী বলে আমাদের দেশী ভাই সাহেবরাও হেসে হেসে চুটকি মেরে বলে থাকেন। আমিও স্বীকার করি, সতীত্ব নষ্টের স্বাধীনতা সে দেশে যথেষ্ট। সে দেশে প্রতি ছ’জনের একজনের জন্ম হয় বিবাহ বন্ধনের বাইরে। ১৯৭৯ সালে ৬ লাখ অবৈধ শিশু মার্কিন মুলণ্ঢুকে জন্ম নিয়েছে। অবৈধ সন্ান জন্ম না নেয়ার ওষুধ ব্যবহার করে যারা অবৈধ সন্ান আগমনকে ঠেকিয়ে রেখে এবং গর্ভপাত ঘটিয়ে মাতা হওয়ার প্রকাশ্য আলামতকে জনমের জন্য অপসারণ করেছে। তারা যদি এসব পদক্ষেপ না নিতেন তাহলে মার্কিন মুলণ্ঢুকে অবৈধ সন্ান ঢাকার রাতের মশার মত বেশুমার হতো। দেশব্যাপী শ্বেতাঙ্গ কুমারীদের এক তৃতীয়াংশ এবং কৃষ্ণাঙ্গ কুমারীদের শতকরা ৮৩ জনের অবৈধ সন্ান রয়েছে। ১৯৮২ সনের মাঝামাঝি যে হিসাব পাওয়া গেছে তা এতই ভয়াবহ যে, আশংকা করা হ ছে ৫/৭ বছর পর গোটা মার্কিন মুলণ্ঢুকে কোটি ডলার পুরস্কার ঘোষণা করলেও ১৩ থেক ১৬ বছর বয়সের একজন কুমারীও পাওয়া যাবেনা। আগে স্কুলের ছাত্রীরা গর্ভবতী হলে বের করে দেয়া হত; কিন্তু আজ কাল তা আর করা হয় না। কুমারী মেয়েদের একথা

বোঝানো হয় যে, বিয়ের পরের অভিজ্ঞতা বিয়ের আগে অর্জন করা ২৬ চ। আমেরিকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যিনি কংগ্রেসের একজন তুখোড় সদস্যও ছিলেন , তিনি একবার বলেছিলেন, আমার বাবার নাম আমি জানি না, মাও বলতে পারেন না, এজন্য আমি গর্ব অনুভব করি। যীশু খৃষ্টও বাবা ছাড়া জন্ম নিয়েছিলেন। আমি অবৈধ সন্ান , সেটাই আমার গর্ব।

এবার চিন্া করে দেখুন, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি এমন উক্তি করতে পারেন তাহলে সে সমাজের নারীদের সম্ভ্রম রক্ষা করে চলা কি সম্ভব ? সম্ভব নয় বলেই তাদের উপর জুলুম চলছে। অবৈধ ভাবে জীবন জাপনের জন্য উৎসাহিত করা হ ছে। তাদের অবৈধ সন্ান প্রতিপালনের জন্য সরকার বছরে ৭০০ কোটি ডলারের চেয়ে বেশী ব্যয় করে থাকে। ২১ থেকে ২৯ বছর বয়স্কা বিবাহিতা মেয়েদের শতকরা ৩৫ ভাগ পর-পুর ষের সংগে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। এটা ১৯৮২ সনের ডিসেম্বরে মার্কিন মুলণ্ডুকের জরিপেরই একটা হিসাব।

১৯৮২ সালের জুলাই এর এক খবরে জানা গিয়েছিল যে, কয়েকজন কংগ্রেস সদস্যের বির দ্ধে যৌন কেলেংকারীর তদন্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যুরো চালা ছে। বিশ বছরের কম বয়স্ক কংগ্রেস বার্তা বাহক ও ভৃত্য তর ণীদের সাথে কতিপয় কংগ্রেস সদস্যের অবৈধ সম্ র্ক ছিল।

জুলুম করার জন্য তাদের নানা ভাবে প্রলুব্ধ করলেও কর্মের অঙ্গনে সম অধিকার কখনো দেয়া হয়না। যেসব ক্ষেত্রে মহিলারা এসেছেন সেখানেও পুর ষেরা তাদেরকে কাজের চেয়ে অকাজেই বেশী ব্যবহার করছেন। বড় বড় পদের প্রায় সবই পুর ষের দখলে। ৯৫ ভাগের মোকাবেলায় মাত্র ৫ ভাগ অথচ সেখানেও নানা যৌন কেলেংঙ্কারী। ইউরোপে কর্মরত মার্কিন সেনাবাহিনীর জনৈক মুখপাত্র উলেণ্ঢখ করেছিলেন যে, ইউরোপে অবস্থানরত মার্কিন সেনাবাহিনীতে বর্তমানে এক সহস্রাধিক মহিলা সৈন্য রয়েছে। কিন্তু তাদেরও দায়িত্ব পালনে নানা বিঘ্ন ঘটে। বিঘ্নটা যে আসলে কি তা সহজেই অনুমেয়। মর্কিন মহিলা সৈনিকদের নিয়ে তাই নতুন নিরীক্ষা চলছে। পাঠকগণই বিচার কর ন, এটা নারী স্বাধীনতা, না স্বাধীনতার নামে নারীদের উপর

জুলুম ? শতকরা ৫ ভাগ নারীকে অধিকার দিয়ে বাদ বাকি ৯৫ জনকে রঙ্গ রসে ভুলিয়ে রাখার নামই কি নারী জাতিকে ইজ্জত করা বুঝ ২৭ অথচ আশ্চর্য! ওরা প্রাচ্যদেশের লোকজনকে নারী স্বাধীনতার সবক শিখায়! আমেরিকার একজন সমাজ বিজ্ঞানী তাই যথার্থই বলেছেন যে, আমরা আধুনিক সভ্যতার কষাঘাতে আমাদের নারী সমাজকে যতটা জর্জরিত করছি তার এক চতুর্থাংশও মধ্যযুগের নারীদের উপর করা হত না।

এবার আলোচনা করা যাক নারী স্বাধীনাতার তীর্থভুমি বিলাত মুলণ্ঢুকের কথা। বলা হয়ে থাকে, নারী স্বাধীনতার প্রথম পথিকৃতই হলো ইংল্যান্ড। এক সময়ে সে দেশকে ডানা কাটা পরীর দেশ বলা হত। সেই দেশে নারীদের উপর কি যে জুলুম করা হয়ে থাকে তা বর্ণনা করলে গা শিউরে উঠবে। আধুনিক যৌন সভ্যতার আফিম খাইয়ে এই জুলুম করা হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য! যাদের উপর যুলুম চলছে তারা এটাকে মোটেই জুলুম বলে মনে করছেন না, আফিমের নেশায় যেন জবান বন্ধ। এই জুলুমের প্রথম জুলুম হল তাদের সতীত্বকে প্রথমেই কেড়ে নেয়া হয়। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের খাতায় রেকর্ড করা আছে যে, ১৯৮১ সালে ১৯ হাজার যৌন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। অবশ্য তারা একথাও একই সাথে স্বীকার করেন যে, এ সংখ্যা হচ্ছে প্রকৃত ঘটনার এক ভগ্নাংশ মাত্র। কোন ঘটনায় দু'জনের মধ্যে যখন গোলমাল লাগে, তখন তা থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়ায় নতুবা রেকর্ড করার কোন প্রশ্নই উঠেনা। এবার বলুন, এটা কি নারীর সম্ভ্রম রক্ষা না লুণ্ঠনের প্রয়াস ? নারী প্রীতির নামে নারী নির্যাতন সে দেশে ইতিহাস হয়ে আছে। কিন্তু সে ইতিহাস আমরা পড়ি প্রেম আর সংস্কৃতির চশমা লাগিয়ে। রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গণ্ঢাডস্টোন সর্বদাই পতিতালয়ে যাতায়াত করতেন। কিন্তু যেদিন তিনি মনে করলেন যে, কাজটা মোটেই ভাল হচ্ছে না, তখন তিনি পতিতালয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়ে এই অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পওয়ার জন্য নিজেকে শক্ত হাতে কষাঘাত করেছিলেন। তার 'রোজ নামচা' দু'খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে, তাতেই এ ঘটনার উলেণ্ঢখ আছে।

প্রফিমো ও কিলারের ঘটনাটি রাশিয়ার আইনভানভকে জড়িয়ে যা সৃষ্টি হয়েছিল তা কে না জানে। এ ঘটনার সংবাদ সারা বিশ্বের ঐ পন্থীরা মুখরোচক চাটনীর মত স্বাদ পরখ করে মনে মনে তৃপ্তি লাভ করেছেন; কিন্তু শিক্ষা লাভ করেননি। প্রিন্স অব ওয়েলস-ঘনিষ্ঠ বন্ধু লর্ড আর্থার সমার সেট-এর ৮২ বছরের পুরোনো ঘটনা মাঝে মাঝে নাড়া দেয়া হয় একটুখানি বৈচিত্র্যের জন্য; এছাড়া কোন মহৎ উদ্দেশ্যে নয়। যদি মহৎ উদ্দেশ্যেই তাই করা হতো তাহলে পার্লেমো সিটির স্কোয়ারে নগ্ন মর্তিগুলোকে চীফ ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে পোষাক পরিয়ে দেয়ার পর কেন এর বিরূদ্ধে আবার আন্দোলন শুর হয়েছিল ? সে আন্দোলনের ফলে আবার বস্াবৃত মতিকে নগ্ন করে ফেলা হলো। এটা কিসের লক্ষণ ? ১৯৮০ থেকে অনুর্ধ ১৬ বছরের ৪ হাজারের অধিক বালিকা ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে গর্ভপাত করিয়েছে এবং অবিবাহিতা মায়েরা ৮১ হাজার শিশু জন্ম দিয়েছে। এটা হছে বৃটেনের জনসংখ্যা জরিপ বিভাগের দেয়া তথ্য।

১৯৮২ সালের ৩০শে ডিসেম্বরের তথ্যে জানা গেছে তাতেও কৌশলে কুমারীদেরকে অসতী করার কাহিনী। সে দেশের একজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, বৃটেনের জনকল্যাণ রাষ্ট্রের আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্য বেকার কিশোরীরা গর্ভবতী হয়। পাঁচজন নবজাতকের মধ্যে তিনজনই কিশোরী মাতার সন্তান। ডঃ ফ্রান্সিস বলেন, ’তাদের কর্মসংস্থান না করার জন্য সরকারকে শাস্তি দেয়ার এটা একটা পন্থা। ১৯৮০ সাল অপেক্ষা ১৯৮১ সালে বৃটেনে শতকরা ৫ ভাগ অবৈধ সন্তানের সংখ্যা বেড়েছে । আর একই হারে ১৯৮২ সালেও বেড়েছে। বিলাতের ১০ হাজার কুমারীর উপর জরিপ চালিয়ে মাত্র একজন পাওয়া গেছে যে নিজেকে কুমারী বলে দাবী করেছে। বৃটেনে ২০ বছর বয়সে যে সব মহিলা সন্তান দেন তাদের অর্ধেকই অবিবাহিতা। বিয়ের আগে বৃটেনের ছেলে মেয়েদের এক সংগে বসবাসের সংখ্যা ৮১ সনের তুলনায় তিন গুন বেড়েছে। ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে বিয়ে করা আর কিছু দিন পর তালাক দেয়া বিলাতী সমাজের একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এসবকে কি নারী জাতির উপর পুরষের ‘রহম’ বলবেন ? আরবের জাহেলিয়াত যুগেওতো এমন জুলুম কখনো হতো না।

ফ্রান্সকে নারী স্বাধীনতার আরেক স্বর্গ বলে মনে করা হয়। সেখানেও নারীকে ভোগের ব্যাপারেই সম-অধিকারের ষোল আনাই হয় কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে নয়। তাদের জাতিয় পরিষদের ৪শ' ৯১ জন ডেপুটির মধ্যে মাত্র ২৫ জন হচ্ছে নারী। কম বেশী এই হার সর্বত্র মানা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের মত নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭২ সালে এই আইন চালু করা হয়েছিল তা কার্যত কেউ মানছে না। তাই ১৯৮২ সনের ডিসেম্বরেই সম-অধিকারের নতুন আইন তৈরী করে পার্লামেন্টে পাস করিয়ে নেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, নয়া আইন অনুযায়ী যেসব নিয়োগকারী নারী-পুরুষ সাম্য মানবে না তারা দু'হাজার থেকে বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক জরিমানা অথবা কেবল দু'মাস থেকে দু'বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ভোগ করবেন। এই বিল পাশ হওয়ার পরও অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, সকল ক্ষেত্রে এ বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব হবে না।

পশ্চিম জার্মান, রাশিয়া, চীন, জাপান এসব দেশের পৃথক পৃথক আলোচনা করলে প্রায় একই ছবি দেখা যাবে। ১৯৩১ সনে এবং ১৯৫০ সনে দু'বার বিবাহ আইন পরিবর্তন করেও চীনা মেয়েদেরকে জুলুম থেকে রক্ষা করা যাচ্ছে না। চীনে বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স করা হয়েছে কনের ২০ বছর এবং বরের ২২ বছর। যৌতুকের বিরুদ্ধে আইন করা হয়েছে তবুও সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। যৌতুকের ভয়ে চীনে শিশুকন্যা হত্যার হিড়িক পড়েছে। ইচ্ছে খুশি তালাক চলছে, পাশবিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। চীনে মহিলাদের মধ্যে আত্মহত্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আত্মহত্যার প্রধান কারণ হিসেবে প্রেমঘটিত কারণই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। মাওবাদী যুগে ছায়াছবি ও সাহিত্যে অশ্লীলতাকে নিয়ে বাড়াবাড়ির সুযোগ ছিলনা ; কিন্তু মাও উত্তর যুগে বিলাত আমেরিকার সংগে অশ্লীলতার কম্পিটিশনে চীন নেমেছে। শুরু হয়েছে জঘন্যভাবে ভোগবাদী জীবন আর তার শিকার হচ্ছে সে সমাজের নারী। এই ভোগবাদী জীবনের নেশা তাদেরকে এমন ভিষণভাবে প্রভাবিত করেছে যে, আপন বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের প্রতিও রূঢ় ব্যবহার শুরু হয়েছে। সে কারণে চীন সরকার বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সম্মান রক্ষার জন্য প্রচার অভিযান শুরু করেছেন এবং নতুন আইন তৈরী করেছেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নিবাসের পরিকল্পনা যেটা আছে তা সম্প্রসারণ করার চিন্তাও করা

হচ্ছে। রাশিয়াতেও একই অবস্থা চলছে; কিন্তু সেখানে উহ্ আহ্ করার

নেই কারও। একটু অবাধ্য হলেই হাওয়া অথবা লাপাত্তা । নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের পর্যন্ত রেহাই দেয়া হয়নি। সন্তান ধারণ থেকে বিমান পরিচালনা পর্যন্ত সব ব্যাপারেই সোভিয়েত নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে। অবাধ নারী ভোগের দেশ রাশিয়া এই জুলুমের পথকেও নারী স্বাধীনতার পথ বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

মৌলবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল, সেকেলে, মধ্যযুগীয়, ধর্মান্ধ, কূপমন্ডুক ইত্যাদি

হয়েছে হয়েছে এত উপদেশ খয়রাত করতে হবেনা, 'নিজের চরকায় তেল দিন' প্রগতিবাদী ও বাদীনীরা হয়ত এই বলে রসুন ফোঁড়ন দিয়ে উঠতে পারেন, আর তাতো উঠবেনই, নইলে তো প্রগতিবাদী হওয়ার সবক পূর্ণ হবে না। এই ইল্মে তা'লীম নিতে গেলে নাকি মোল্লা-মৌলভীদের কথায় নাক সিটকাতেই হয়, তাঁদেরকে গলা ছেড়ে গালি দিতে হয়। আর তাঁরা যেসব পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার,-আচরণ ও ভাষা ব্যবহার করেন, সেগুলি অতি অবশ্যি পরিহার করে চলতে হয়। উচু মহলের প্রগতিবাদীরা আজকাল আরবী, ফার্সী, উর্দ ইত্যাদি পশ্চাদমুখী (?) শব্দের সাথে সে জন্যেই নাকি সতীনের জীবন যাপন করেন। মনের মত বাংলা শব্দ না পেলে সংস্কৃত অভিধান খুলে তারা শব্দ সংগ্রহ করেন।

প্রগতিবাদী হওয়ার জন্য তারা ইসলামকে মৌলবাদ, মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা, প্রাচীন মতবাদ ও ইসলামপন্থীদেরকে 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'সেকেলে', 'মধ্যযুগীয়', 'ধর্মান্ধ', 'কপমন্ডুক', 'মৌলবাদী' ইত্যাদি বুলি বচনে বিভষিত করে থাকেন। অধুনা এক রকম ভদ্র ভাষায় কড়া গালিরূপে ব্যবহার হয় এগুলো। এরকম গালি দেয়া নাকি প্রগতিবাদী হওয়ার ডিপ্লোমেটিক টেকনিক। আভিধানিক ও তাত্ত্বিক দিক থেকে কথাগুলো সত্য যদিও তার মতলব নেয়া হয় খারাপ। অভিধানে দেখতে পাই মৌল শব্দের অর্থ মল সম্বন্ধীয়, মূলোৎপন্ন, মলগত, মৌলিক ইত্যাদি- অতএব মৌলবাদের অর্থ হবে মলভিত্তি নির্ভর, কিংবা মলের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন আদর্শ, যে আদর্শের কোন মল ভিত্তি রয়েছে তাই মৌলবাদ আর তারই অনুসারীগণ হবেন মৌলবাদী। পক্ষান্তরে সব ভিত্তি মলকে অস্বীকার করে যারা আদর্শের ক্ষেত্রে জারজ হয়ে যেতে চান

তারাই হবেন অমৌলবাদী তথা প্রগতিবাদী। নাটাই থেকে বিচ্ছিন্ন কিংবা হাল বিহীন তরীর মত হাওয়ার তালে তালে নেচে যারা প্রগতিবাদী হতে চায় তাদের আবার মল ভিত্তি কোথায় ? যাযাবরের আবার সম্ত্তির পৈত্রিক উত্তরাধিকার। আর ইসলামপন্থী তথা মাওলানা-মৌলভীরা একটা আদর্শিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, নবুয়তের এক অবিচ্ছিন্ন মল সত্রধারার সাথে সংশিণ্ঢষ্ট তারা। অতি প্রাচীনকাল থেকে সে ধারা ক্রমোন্নত হয়ে পরিপর্ণতা লাভ করেছে সেই ধারার সর্বশেষ বাহক মুহাম্মদ (সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম)-এর মাধ্যমে। সুতরাং এই অর্থে ইসলামপন্থীরা 'সেকেলেও'। সেকেলের আভিধানিক অর্থই হল প্রাচীনপন্থী অর্থাৎ, প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা সত্যের সুপরিচিত এক ধারার উত্তরাধিকারী তারা। তারা বংশ পরিচয়হীন আদর্শের কুলটা (তথাকথিত প্রগতিবাদী) নয়। আর এ কারণেই তাঁদের প্রতি প্রগতিবাদীদের এত ক্ষোভ। তাদের মত রসাতলে তারা কেন যায় না, হাওয়ায় ভেসে তারা কেন চলে না এখানেই যত খেদ। আর খেদ হওয়াই স্বাভাবিক। ধনবানদের দেখে প্রলেতারিয়েতদের চোখ টাটানোরই কথা।

অভিধানে দেখতে পাই, 'প্রতিক্রিয়া' অর্থ প্রয়োগের পরে যে ক্রিয়া হয়। বিপরীত ক্রিয়া। (যেমন-উত্তেজনার পর অবসাদ, আনন্দের পর বিষাদ, আঘাতের পর প্রতিঘাত। (ইং ৎবধপঃরড়হঃ প্রতিকার।) এ অর্থে সৃষ্টির সকল কিছুই প্রতিক্রিয়াশীল-উত্তেজনার পর অবসাদ, আনন্দের পর বিষাদ, উত্থানের পর পতন, আলোর পর আঁধার, জন্মের পর মৃত্যু; এতো প্রকৃতির এক অমোঘ বিধান। প্রগতিবাদীরা যদি এর থেকে মুক্তি লাভ করতে চান, তাহলে আলণ্ঢাহর এই প্রকৃতির বাইরে চলে যান এবং বিপরীত ক্রিয়ার জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে খাঁটি অর্থে অপ্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠুন। ধরি মাছ না ছুই পানি-এই নীতি এখানে চলবে না । আলণ্ঢাহর প্রকৃতিতে বাস করে তার অমোঘ নীতি কিন্তু লংঘন করা সম্ভব হবে না। প্রগতির নামে এই উত্তেজনা এবং সুড়সুড়ির কিন্তু এক সময় অবসান ঘটবে। যত পার নাচ, গাও, মউজ কর-বোতলে বোতলে গিলতে থাক, কাপড়ের জঞ্জাল মুক্ত হয়ে বীনের তালে তালে নৃত্য কর, প্রগতির রস সরোবরে মনের সুখে সাঁতার কাট, নিজ

ধর্মের বেড়া ডিঙ্গিয়ে যত পার পরের সীমানায় পয়মালী কর, পাশ্চাত্যের সর্বনাশা যৌন জীবন ধারার আ ছামত নেসাব পুরো করে মহড়া শুর কর, রঙ্গরসের লীলাখেলায় নেগেটিভ পজিটিভ তরঙ্গে একাকার হয়ে লাপাত্তা হয়ে যাও, কিন্তু জেনে রাখ-এর কিন্তু অবসান আছে, যে যাত্রা তোমরা শুর করেছ তার শেষ দেখে সব কিছু যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে, কোমরে যখন বার্ধক্যের বাত ব্যাথা শুর হবে, গিরায় গিরায় যখন পেনশনের সর বেজে উঠবে , তখন কিন্তু বাধ্য হয়েই তোমাকে বিপরীত ধারা গ্রহণ করতে হবে। এভাবে তোমাকে জীবনের শেষ মুহুর্তে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যেতে হবে। মৃত্যুর সময় সারা জীবনের ঈমান (?) (প্রগতিশীলতা) পরিত্যাগ করা? ছি! ছি!! ছি!!! আর হ্যাঁ আজ থেকে মোলণ্ডা- মৌলভীদের কথায় নাক সিটকালে চলবেনা, তাহলে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়তে হবে। ভাল কথায় মন্দ প্রভাব গহণ করলে সেওতো হবে প্রতিক্রিয়াশীলতা। প্রগতিবাদীই যদি হতে হয় তাহলে বিপরীত ক্রিয়া থেকে থাকতে হবে লক্ষ যোজন দরে।

'মধ্যযুগীয়' কথাটার একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। মোটামুটি ভাবে **১১**শ থেকে **১৭**শ শতাব্দী পর্যন্ যুগকে মধ্যযুগ বলা হয়, যে যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির ফলে মানুষের জীবন যাত্রায় বৈপণ্ডবিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তখন সবেমাত্র ইউরোপে নতুন জ্ঞান সাধনার উন্মেষ হতে শুর করেছে। আর পাদ্রীদের মনগড়া গবেষণাহীন মতামত গবেষকদের কাছে ভ্রান্ বলে প্রমাণিত হতে শুর করেছে । এভাবে সৃষ্টি জগতের রহস্য যতই উদঘাটিত হতে থাকে, বিজ্ঞানীদের সাথে পাদ্রীদের মতবৈষম্য ততই প্রকট হতে থাকে। পাদ্রীগণ তখন শাসন শক্তি প্রয়োগ করে গবেষক ও বিজ্ঞানীদের শায়েস্তা করতে থাকে। অবশেষে শুর হয় উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। দীর্ঘ দু'শ বৎসরের (ষোল ও সতের শতাব্দী) এ সংগ্রাম ইতিহাস পাঠকের নিকট 'গীর্জা বনাম রাষ্ট্রের সংগ্রাম নামে পরিচিত। স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রকৃত ইল্‌মে ওহীর সাথে (যার উপর ইসলামপন্থীরা প্রতিষ্ঠিত তার সাথে) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার (যদি তা সঠিক হয়) ও উদঘাটিত সৃষ্টি রহস্যের তাত্ত্বিকভাবে কোন সংঘাত বা বৈপরিত্য নেই, থাকতে পারেনা । আরও স্বরণ করা যেতে পারে যে, পাদ্রীগণ সঠিক ইল্‌মে ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না,

তারা মন গড়া কিছু মতাদর্শকে ধর্মের নামে শোষণের হাতিয়ার হি সম্বল করে অতি সুখে দিন গুজরান করছিল। এরই ফলে বিজ্ঞানের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। কিন্তু দর্ভাগ্যের বিষয়, এটাকেই ইউরোপীয়রা ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সংঘাতরূপে অভিহিত করে আর তাদের এদেশীও এজেন্টরা তা তড়িৎ বেগে আমদানী করে ফেলে। সম্ভবতঃ মধ্যযুগীয় বলতে ওরা ইসলাম পন্থীদেরকে বিজ্ঞান বিরোধীরূপে অভিহিত করতে চায়। কিন্তু এটা পাদ্রীদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে ইসলামপন্থি আলেম মৌলভীদের ব্যাপারে নয় । বরং ইসলামপন্থিদের মতাদর্শ ও অবস্থান সেই মধ্য যুগেও যেমন বিজ্ঞানের সাথে সংঘাতবিহীন ছিল, এখনও তথৈবচ রয়েছে। সুতরাং এই অর্থে তাদেরকে মধ্যযুগীয় বলা যথার্থ যে, মধ্যযুগে তাদের চিন্তাধারা ও মতাদর্শ বিজ্ঞানমুখী ছিল। অর্থাৎ,ব্যাপারটা সম্ র্ণ উল্টে গেল। প্রগতিবাদীরা মৌলবাদী কথাটাকে সম্ র্ণ উল্টে দিল। এভাবে প্রগতিবাদীরা যখন উঠে পড়ে লাগে তখন দিনও রাত্রে রূপান্তরিত হয়।

'সেকেলে', 'ধর্মান্ধ', 'কূপমন্ডুক' ইত্যাদি কথাগুলিকেও সম্ভবতঃ অনুরূপ অর্থে ব্যবহার করা হয়, অথচ শাব্দিক অর্থে কথাগুলি সত্য। ধর্মান্ধ অর্থাৎ, ধর্মের প্রতি যার অন্ধের ন্যায় বিশ্বাস, কোনরূপ যুক্তি দ্বারা বোধগম্য না হলেও দলীল প্রমাণ না পেলেও যে তার ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ীভাব পোষণ করে। এই অর্থে প্রত্যেক ধর্ম বিশ্বাসী ব্যক্তিই ধর্মান্ধ বা তাকে অনুরূপ হতে হবে। কারণ, ধর্মীয় বিশ্বাসে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা দলীল প্রমাণ দ্বারা বোধগম্য করা সম্ভব নয় বা দলীল প্রমাণ সকলের সংগ্রহের কোন অপরিহার্যতাও নেই। সুতরাং ধর্মান্ধ হওয়া কিভাবে দষণীয় হল তা আমাদের বোধগম্য নয়। অভিধানে দেখতে পাই, ধর্মান্ধ অর্থ নিজের ধর্মের দৃঢ় বিশ্বাস যুক্ত এবং পরধর্ম বিদ্বেষী; গোঁড়া ...ইত্যাদি। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে পরধর্ম বিদ্বেষী হওয়ার সুযোগ হয়তো থাকতে পারে এবং তা রয়েছেও। কিন্তু ইসলামে তা আদৌ নেই। ইসলাম ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস যুক্ত কোন ব্যক্তি অপর ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী হতে পারেনা , অতএব অভিধানে 'ধর্মান্ধের' যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা কোন ইসলামপন্থীর ব্যাপারে প্রযোজ্য হওয়ার অবকাশ নেই ; যদি কেউ তা মনে করেন তাহলে তা হবে তার অজ্ঞতা

জনে বুঝে ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি যারা অন্ধ,তাদের ক্ষোভ হল ইসলামপন্থীরা ধর্মান্ধ না হয়ে বিজ্ঞানান্ধ কেন হয় না , কেন বিজ্ঞানকে চোখ কান বুজে পরম ভক্তি সহকারে অর্ঘ নিবেদন করা হয় না ? বিজ্ঞানের বেদীমলে তারা পাঠাবলি দিন কিন্তু ধর্মের প্রতি এই বিষোদগার এবং ধর্মের প্রতি মানুষের মনে অনীহা সৃষ্টির এই অপকৌশল কেন ? ধর্মের ব্যাপারে অন্ধ হওয়ার অবকাশ থাকতে পারে কারণ তার উৎস মানবীয় জ্ঞানের উর্ধে অবস্থিত । পক্ষান্তরে বিজ্ঞান মানুষেরই উদ্ভাবিত, সে ক্ষেত্রে অন্ধ হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই।

একটি শব্দ রয়েছে 'কূপমন্ডুক'। এর অর্থ হল কুয়ার ব্যাঙ। বাগধারা হিসেবে এর অর্থ হল অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। যারা এই শব্দটি ব্যবহার করে আনন্দ পান বা আত্নতৃপ্তি লাভ করে থাকেন, তারা কোন্ মহাসাগরের রুই কাতলা তা আমরা জানিনা । তবে এতটুকু সত্য যে , জ্ঞানের বিশাল সমুদ্রের কিনারা করা সম্ভব নয় কোন মানুষের পক্ষে । পৃথিবীর ইতিহাসে যারা বিদ্যাসাগর , জীবন্ত পাঠাগার, বিদ্যাকল্পদ্রুম প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন তাদের জ্ঞানের দৌড়ও নাকি সমুদ্র কুলের নুড়ি কুড়াতেই হাঁপিয়ে উঠেছে । এই হিসেবে কিন্তু সকলেই কুয়ার ব্যাঙ বা কূপমন্ডুক । তবে হ্যাঁ চুনোপুটিরা একটু বেশী লাফালাফি করে থাকে বটে। 'খালি কলসী বাজে বেশী' প্রবাদটি তাদের সদয় অবগতির জন্য পেশ করা যেতে পারে ।

গণতন্ত্র

আজকাল একটা শব্দ অহরহ শোনা যায়। ঢাকা শহরের মশা যেমন কানের ধারে ঘ্যানর ঘ্যানর করে , কিংবা কূপমন্ডুক নারী যেমন স্বামীর সাথে ঘ্যানর ঘ্যানর করতে করতে সংসারে ভাংগন ধরায়, তেমনি ভাবে এই শব্দের মায়া কান্না আর প্যানপ্যানানীতে বিশ্ব সংসারে এক হুলস্থুল কান্ড বেধে গেছে। মসজিদ শহর ঢাকা মহানগরীর সমস্ত মিনার থেকে একযোগে যেমন আজান ধ্বনিত হয় তার চেয়েও উচ্চ গ্রামে এই শব্দের নকীবরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বিশ্ববাসীকে তার পাশে সমবেত হতে আহবান জানায়। যে শব্দের গোলক ধাঁধাঁয় বিশ্বের মানুষ প্রতিনিয়ত চক্রাকারে ঘোরে , যার নেশায় রঙিন স্বপ্ন দেখে পৃথিবী । সে শব্দটি হল 'গণতন্ত্র'। এটা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একটা পরিভাষা। রাষ্ট্র

বিজ্ঞানের দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী এর অর্থ হল-জনসাধারণের প্রতি
দ্বারা সাম্যের নীতি অনুসারে রাষ্ট্র শাসন বা সাধারণতন্ত্র। কথাটার ভুল ধরার সাধ্য কার ? রাষ্ট্র শাসনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত না করে প্রত্যেকেই যদি রাষ্ট্র নায়ক হয়ে বসেন তাহলে রাষ্ট্র তখন নির্ঘাত পাবনার মেন্টাল হাসপাতালে পরিণত হবে সন্দেহ নেই । আবার জনগণের নির্বাচন ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালক গোষ্টি আপনা-আপনি নির্ধারিত হয়ে গেলে তাদের নের্তৃত্বে জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটবেনা বরং তা স্বে ছাচারিতায় পরিণত হবে। সুতরাং গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বৈ কি ? কিন্তু হালে গণতন্ত্র কথাটাকে প্রত্যেকেই নিজের মতলব সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে-ক্ষমতাসীন দল তার ক্ষমতার মসনদ পাকা-পোক্ত রাখার জন্য গণতন্ত্রের বুলি আওড়ান , আর বিরোধী দল ক্ষমতা দখলের জন্য গণতন্ত্রের ধুয়া তোলেন ।এ কারণে কি ক্ষমতাসীন কি বিরোধী দল প্রত্যেকেই গণতন্ত্রকে (?) টিকিয়ে রাখার জন্য যে কোন অগণতান্ত্রিক পন্থা অবলিলায় গ্রহণ করতে পারেন। সরকারী দল তাই নির্বাচনের সময় নিজেদের কর্মীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেন, আর বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও ভিন্ন মতাবলম্বীদের কর্মীদেরকে গুপ্তহত্যা এমনকি প্রকাশ্যে হত্যা পর্যন্ত করে থাকেন। আর এ সবই হয়ে থাকেন গণতন্ত্রেরই স্বার্থে (?)।

'গণতন্ত্র' রাষ্ট্রের একটা মলনীতি । অতএব আগেভাগেই বলে রাখছি-গণতন্ত্র সম্ কর্কে আমি সামনে যে ব্যাখ্যা দিছি তা দ্বারা আমি রাষ্ট্রনীতির বির দ্ধে বলছিনা । অযথা পুলিশের ঠ্যাঙ্গানি খাওয়া কিংবা বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেল হাজতে পচার মত সৎ সাহসের বড্ড অভাব আমার মধ্যে। বরং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বাক স্বাধীনতা বলে যে একটা মৌলিক অধিকার রয়েছে আমি শুধু সে অধিকারটাই প্রয়োগ করছি মাত্র। প্রচলিত গণতন্ত্রবাদীদের কাছে হয়তোবা এর বিপরীত কোন ব্যখ্যা থাকতেও পারে।

সত্য ভাষণ অমার্জনীয় অপরাধ না হলে বলতে ই ছা করে যে, বর্তমান বিশ্বে 'গণতন্ত্র' হল একটা অশ্বডিম্ব-যা শুধু বুলি বচনেই পাওয়া যায়, বাস্তব অস্তিত্ব বলতে যার কিছু নেই। শব্দটার মাধ্যমে শুধু

রিতই হচ্ছি আমরা । যেমন ধরুন গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ‘জনগণের প্রতিনিধি.. ..’ এই প্রতিনিধি ঠিক হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। এখন নির্বাচন যদি এমন হয় যার দ্বারা অধিকাংশ জনগণ তাকে চায় কি চায় না তা নিরূপণ করাই হ-য-ব-র-ল হয়ে পড়ে, কিংবা জনমতের প্রতিফলন আদৌ ঘটবারই অবকাশ না থাকে , তাহলে কিন্তু আর গণতন্ত্র রইলনা। বর্তমানে নির্বাচন কেমন হচ্ছে তা পাঠক মন্ডলী সম্যক অবগত থাকবেন। এ সম্পর্কে জনৈক রম্য রচনাকারের কিছুটা উদ্ধৃতি তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারছিনা। তিনি লিখেছেন ’নির্বাচনের সময় আমরা হুজুগে মেতে উঠি। নেতা নির্বাচনের প্রথম ভিত্তিই হল হুজুগ। তারপর মাল-পানির বিনিময়ে ভোট বেচাকেনার হিড়িক। এক প্যাকেট স্টার সিগারেটের মল্যে, কেউবা মুরগির মল্যে ভোট বিক্রি করে থাকি। এক গ্রামের একজনকে ভোট দেয়ার প্রতিনিধি প্রেরণ করে গোটা গ্রামের ভোট একজনের নামে বোঝাই করার কারবারও করে থাকি। কবরবাসী আর শ্মশানবাসীদের ডেকে এনে ভোট দেয়ার কাজে লাগাই। মুফিজ আলী আর সুনিল দত্ত দশ বছর আগে কলেরায় মারা গেছেন, ভোটের দিন বেলা শেষে ভোটের লিষ্টে দেখা গেল তারাও কোন ফাঁকে কবর আর শ্মশান থেকে এসে ভোট দিয়ে গেছেন । একজন মহিলা একাই পাঁচটা ভোট দিয়েছেন অর্থাৎ,তিনি পাঁচবার পাঁচজন স্বামীর নাম উচ্চারণ করেছেন, আসলে তিনি কোন্ স্বামীর স্ত্রী তা তিনিই ভাল জানেন। পুরুষদেরও অনেকে একা পাঁচ সাতটা ভোট দিয়ে পাঁচ সাতজনকে বাপ ডেকেছেন। এসব হচ্ছে আমাদের নেতা নির্বাচনের জন্য ভোটারের গুণাবলী। তারপর রয়েছে ভোটের বাক্স ছিনতাই করার রণনিপুনতা আর খুন জখম করার হাত ছাফাই। নেতার যোগ্যতাতো মাশাআল্লাহ বহু ক্ষেত্রে কলাগাছ বা মাদার গাছ। ‘অক্লান্ত সমাজ কর্মী’ বা ‘জনগণের নয়নমণী’-দের চারিত্রিক দিকটা একবারও ভেবে দেখা হয়না।’ (অপসংস্কৃতির বিভীষিকা)

হয়তো বলবেন সাহেব! এ হল শুধু অনুন্নত বিশ্বের দোষ, উন্নত বিশ্বে ঠিকঠাক মতই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রথমতঃ কথা হল নির্বাচনে কারচুপির ব্যাপারটি আজ সারা বিশ্বেই পরিব্যাপ্ত। দ্বিতীয়তঃ

যদি মেনেই নেয়া হয় যে সব লোক একেবারে ফেরেশতা খাসল হয়ে গেল, নির্বাচনে কোন কারচুপির আশ্রয় নেয়া হলনা , তারপরও কি নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষে জনমত বেশী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত ? হয়তো পাগলের প্রলাপ বলবেন, কারণ সংখ্যায় যার ভাগে ভোট বেশী পড়ে সেইতো নির্বাচিত হয়, সেখানে আবার অনিশ্চিতের প্রশ্ন কেমন করে ওঠে ? ব্যাপারটি একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বোধগম্য করা সহজ হবে। মনে করুন সলিমুদ্দীন, কলীমুদ্দীন আর মুনিরুদ্দীন এক এলাকায় ভোট প্রার্থী। নির্বাচনে সলীমুদ্দীন পেল ৪০০ ভোট, কলীমুদ্দীন পেল ৩০০ আর মুনীরুদ্দীন পেল ২০০ । এখন গণতন্ত্রবাদীদের বিচারে সলীমুদ্দীনকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হবে , কারণ তার পক্ষে ভোট বেশী। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে তার পক্ষে ৪০০ হলেও বিপক্ষে পড়েছে ৫০০ অর্থাৎ, কলীমুদ্দীন ও মুনিরুদ্দীন যে পাঁচশত ভোট পেয়েছে তা সলীমুদ্দীনের বিপক্ষে । তাহলে দেখা গেল ৪০০ লোক সলীমুদ্দীনকে চায় আর ৫০০ লোক তাকে চায়না । অতএব এখানে অধিক জনমত তার বিপক্ষে । তবুও গণতন্ত্রবাদীদের বিচারে সেই হল বিজয়ী। হয়ত দুজন প্রার্থীর ক্ষেত্রে এ জটিলতা থাকবেনা , কিন্তু সেখানেও গোল থেকে যায়-যাদের ভোট কাষ্ট হলনা তাদের মত পক্ষে না বিপক্ষে তাতো কিছুই জানা গেলনা । হতে পারে তাদেরকে মিলিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির বিপক্ষের জনমতই হয়ে যাবে বেশী। ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়নি বলেই কি তাদের মতামতের মল্যায়ন হবে না ? হতে পারে প্রার্থীদের কেউই তাদের মনপুতঃ নয়। তাই অযথা হাজিরা দেয়ার ঝামেলা করেনি তারা। তাছাড়া 'কাউকে চাই না' মতটা প্রকাশের জন্য ব্যালট পেপারেও তো কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

গণতান্ত্রিক অধিকার

এতসব কিছুর পরও গণতন্ত্রের পেছনে কাঠখড় পোড়ানো হয় কেন ? উত্তর একটাই যা পর্বে দেয়া হয়েছে। আজকাল আবার অনেকে 'গণতন্ত্র'-এর দোহাই দিয়ে অন্য রকম একটা মতলব সিদ্ধি করেন। একজন কোন অন্যায় কাজ করলেও নাকি অন্যজন তাকে বাঁধা দিতে

ন না। কারণ তাতে নাকি তার গণতান্ত্রিক (?) অধিকার বা ভিন্ন ভাষায় তার ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হয়। এ কারণেই নাকি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বিয়ে ছাড়া নর-নারীর একত্রে বসবাস (লিভ ইন লাভার) এমন কি সমকামীদের বিয়েও চার্চ কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত হয়েছে। কারণ বিপরীত হলে নাকি ব্যক্তি স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হয়। এরই ফলে সে দেশে এখন বিবি বিনিময়, স্ত্রী রেখে গার্ল ফ্রেন্ডের সাথে, কিংবা স্বামী রেখে বয় ফ্রেন্ডের সাথে বসবাসের বিষয়টি নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলোতে কেউ বাঁধা দিতে গেলে অন্যের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার দায়ে তাকে অভিযুক্ত হতে হয়। সেখানে এখন দেদারছে এই ব্যক্তি স্বাধীনতার সুব্যবহার (?) চলছে, যার ফলে যাদু ঘরে রাখার জন্যেও নাকি একজন কুমারী মেয়ে খুঁজে পাওয়া দায় হয়ে পড়েছে। কিছুদিন পর্বে (২১শে বৈশাখ ১৩৯৫ এর) একটি দৈনিকের উপ-সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত একটি বিবরণের কিয়দংশ ছিল এরূপ-'লন্ডনের এক টিউব ষ্টেশন। দুই তরুণ-তরুণী আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় চুম্বনরত। একটু দরে এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে অপলক নেত্রে সেই দৃশ্য উপভোগ করছে। এক বাংলাদেশী তরুণ সাংবাদিক কৌতুহলী হয়ে বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান যে, তার স্বামী আছেন কিন্তু তার সঙ্গে থাকেন না। দুই মেয়ে সাবালিকা হওয়ায় তারা বয় ফ্রেন্ডের সাথে অন্যত্র থাকে। একমাত্র ছেলেও অন্য শহরে থাকে। আপনি তাহলে একা থাকেন ? সঙ্গের কুকুরটি দেখিয়ে বৃদ্ধা বললেন একা কেন ? এইতো আমার সঙ্গী। বিয়ের আগে আপনার কোন বয়ফ্রেন্ড ছিল ? হ্যাঁ ছিল, মাত্র দু'জন।'

এই গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ হবে বলে এইড্স রোগ প্রতিরোধের জন্য অবাধ যৌনাচার বন্ধ করতে না বলে খৃষ্টান চার্চ অতি সম্প্রতি কনডম ব্যবহারের ফতোয়া দিয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল- তাহলে স্বৈরাচার ও গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় পার্থক্য রইল কোথায় ? স্বৈরাচার অর্থ হল নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী আচরণ। সুতরাং স্বৈরাচার বা যাচ্ছে তাই করাই যদি গণতান্ত্রিক অধিকার হয়ে যায়, তাহলে স্বৈরাচারের নিন্দা করা

হয় কেন ? আর কেনই বা গণতন্ত্রেরই দোহাই দিয়ে স্বৈর সরকারের পদত্যাগ দাবী করা হয় ? পক্ষান্তরে সরকার পক্ষই বা কেন ভাংচুর ও জ্বালাও-পোড়াও এর নিন্দা করে তার বিরূদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যান ? একজনের ইচ্ছার বিরূদ্ধে তার পতন দাবী করা কি তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয় ? গণতন্ত্রবাদীদের এই অসংগতির কোন সদুত্তর হবে কি ? অবাধ যৌনাচারিতা, নৈতিক বল্গাহীনতা সবই যদি ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার বলে স্বীকৃতি পেতে পারে, তাহলে চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবী ইত্যাদি যার যা ইচ্ছা তা করুক সেটা তার ব্যক্তি স্বাধীনতা , তাতে বাঁধা দেয়া হয় কেন ? কোন দর্মুখের যদি ইচ্ছে হয় কোন গণতন্ত্রবাদীর নাকের ডগায় একটা যুৎসই ঘুষি বসিয়ে দেয়ার, তাহলে কি গণতন্ত্রবাদী এটাকে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে স্বীকৃতি দিবেন? আসলে তারা ভালভাবেই জানেন যে, ব্যক্তির আচরণ যখন তার ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তার কুপ্রভাব নিজের বলয় ছেড়ে অন্যের পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখন সেটা ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকেনা। বরং তখনই তা গর্হিত বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু যেখানে স্বার্থ নিহিত থাকে সেখানে স্বার্থবাদীরা সেটাকে ‘গণতন্ত্র’, ‘ব্যক্তি স্বাধীনতা’ ইত্যাদি বলে চালিয়ে দেয়। এতে করে সত্য কথার আড়ালে বদ মতলব সিদ্ধির পথ সুগম হয়। চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবী ইত্যাদির মন্দ প্রভাব সমাজের অন্যের প্রতিও বিস্তৃত হয়, অন্যেও ক্ষতিগ্রস্থ হয় এর দ্বারা, কাজেই এগুলি যদি ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার বলে স্বীকৃতি না পায় ও নিন্দিত হয়, তাহলে অবাধ যৌনাচারিতা ও অবাধ অসামাজিক কার্যকলাপের ফলে যখন সমাজে নানা রকম রোগ-ব্যাধির বিস্তৃতি হয় (এমনকি এইড্‌সের মত রোগও) তার ফলে কি সেটা নিন্দিত হতে পারে না ?

ব্যক্তি স্বাধীনতা , ধর্ম নিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা

আর একটা মজার ব্যাপার হল ইসলামের কথা বলা হলে বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়নের কথা বলা হলে এই অবাধ গণতন্ত্রবাদীরাই তখন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন। কোমরে গামছা বা শাড়ীর আঁচল পেঁচিয়ে আদা জল খেয়ে তখন

তায় লেগে পড়েন তারা। তাহলে ব্যক্তি স্বাধীনতা বা গণতান্িক অধিকার এতে খর্ব হয় না ? দেশের অধিকাংশ জনগণ যদি মুসলিম হয় মনে-প্রাণে যদি তারা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী মল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে গণতান্িক অধিকার হিসাবে সেটা স্বীকৃতি পাবে না কেন ? গণতন্বাদীরা তাদের এই স্ববিরোধিতার কোন সদুত্তর দিতে পারবেন কি ?

তারা ধর্ম নিরপেক্ষতার যুক্তি পেশ করে থাকেন এবং ইসলাম অসাম্্দায়িক ধর্ম, ইসলামে কোন সাম্্দায়িকতা নেই এ কথারও অবতারণা করে থাকেন। আভিধানিক এবং তাত্ত্বিক দিক থেকে কথাগুলি সত্য। অভিধানে দেখতে পাই 'নিরপেক্ষ' অর্থ-স্বতন্, স্বাধীন, পক্ষপাতশণ্য ইত্যাদি। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হবে ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাতন্, ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীনতা বা ধর্মের পক্ষপাতশণ্যতা। এ অর্থে ইসলাম সত্যিই ধর্ম নিরপেক্ষ। কারণ ইসলাম জোর পর্বক কাউকে ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেনা। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্কে সে অক্ষুন্ন রেখেছে এবং ইসলামে কোন পক্ষপাতিত্বও নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদেরই তার নিজস্ব ধর্ম-কর্ম পালন করার অধিকার রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার প্রত্যেকের সমান। এ অর্থে ইসলামে কোন সাম্্দায়িকতা নেই তাও সত্য। তার কারণ উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামের কথা শুনে যারা এই ধর্ম নিরপেক্ষতা বা অসাম্্দায়িকতার বুলি আওড়ান, তাদের কিন্তু মতলব খারাপ! তারা সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্র্জাতিক পর্যায়ে ধর্মীয় মল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পরিপন্থি। ইসলামকে তারা নিতান্ ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া ব্যাপার-স্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্র্জাতিক অঙ্গন থেকে ধর্মকে নির্বাসিত করাই তাদের লক্ষ্য। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম-কর্ম করার বির দ্ধে তাদের কোন আপত্তি নেই। এরই নাম দিয়েছে তারা ধর্ম নিরপেক্ষতা । ইংরেজী 'সেকুলারিজম' শব্দেরই বাংলা অনুবাদ এটা। এক শ্রেণীর প্রগতিশীলরা এটাকে আধুনিক মতাদর্শের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। ইউরোপে পাদ্রীদের মনগড়া মতামতের সাথে যখন গবেষক ও বৈজ্ঞানিকদের গবেষণালব্ধ

মতামতের দ্বন্দ্ব দেখা দিল এবং তারই ভিত্তিতে পাদ্রীদের উৎখাত জন্য ‘গীর্জা বনাম রাষ্ট্রের লড়াই’ নামক দু’শ বৎসর ব্যাপী ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পরিচালিত হল, তখন সংস্কারবাদীরা একটা আপোষ রক্ষার জন্য মার্টিন লুথারের নেতৃতে প্রস্তাব দিল যে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকুক আর সমাজের ও পার্থিব জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যাস্ত থাকুক। এরপর থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে খৃষ্টান ধর্মযাজক ও পাদ্রীদের প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন ধর্মীয় প্রবনতা থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। এখান থেকে ‘ধর্ম নিরপেক্ষতা’ মতবাদের যাত্রা হয় শুর ।

খৃষ্টান ধর্ম যাজকদের মতবাদে সামজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কর্মকান্ড পরিচালনার মত কোন সুষ্ঠু আদর্শ বর্তমান ছিল না। ফলে তাদের সমাজে ধর্ম নিরপেক্ষতার আন্দোলন যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু ইসলাম যেখানে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য শাশ্বত আদর্শ রেখেছে এবং তা স্বয়ং সর্বজান্তা সর্বজ্ঞ আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত আদর্শ, সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলা কতখানি অজ্ঞতা বা জেনেবুঝে ধৃষ্টতা, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। খৃষ্টান ধর্ম যাজকদের মনগড়া রচনা আর কুরআনের বিশুদ্ধতম ওহীকে এক পালণ্ঢায় মাপাকে নিরেট অজ্ঞতা কিংবা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুশীলন বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

সম্প্রতি রাষ্ট্রধর্ম বিল প্রসঙ্গে একজন ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী দলীয় নেতার মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি এটা সাম্প্রদায়িকতা , ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিপন্থী প্রভৃতি বাঁধা বুলি সম্বলিত ভাঙ্গা রেকর্ড খানা হুবহু বাজিয়ে দিলেন। ইসলামের মত অন্যান্য ধর্মকেও সাম্প্রদায়িকতা মনে করেন কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি অমন গড়গড় করে উত্তর দিতে পারলেন না । বুঝা গেল তার হোম ওয়ার্ক করা নেই। ইসলাম, খৃষ্টধর্ম, ইহুদী ধর্ম, হিন্দু ধর্ম প্রভৃতির মাঝে পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত আছেন কি না জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে, এ বিষয়ে তার কোন বিস্তারিত জ্ঞান নেই । এতে করে বোঝা গেল ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে তারা কোন খবর রাখেন না অর্থাৎ, না জেনে শুনেই তারা

ামকে সাম্প্রদায়িকতা বলে গালি দিয়ে থাকেন। তা ছাড়া জ্ঞান পাপীর সংখ্যাও যে রয়েছে অনেক তাও হলফ করে বলা চলে। এই তথা কথিত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা মলতঃ ধর্ম নিরপেক্ষতা নয় ধর্মহীনতা বা ধর্মনির্মলতা চায়। প্রমাণ তার অনেক। এ দেশের একটি চিহ্নিত ইসলাম-বিরোধী মহল থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ানো হয়। ইসলাম বিরোধী কোন কিছু করলে সেটাকে তারা প্রগতিশীলতা ভাবেন। আর ইসলামকে তারা সাম্প্রদায়িকতা বলেন। বিসমিল্লাহ বলে বা কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করলে এর মধ্যে তারা সাম্প্রদায়িকতার দর্গন্ধ আবিস্কার করে প্রায় বমি করে ফেলেন। অথচ তারা যখন মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে, ওম শান্তি! ওম শান্তি! উচ্চারণ করে অনুষ্ঠান শুরু করেন এবং অনুষ্ঠান পর্ব শেষ করেন ‘নমোঃ তস্য ভগওয়াতো অরহোতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য’ বলে, তখন কিন্তু তাতে সেই সাম্প্রদায়িকতার দর্গন্ধ তারা পান না বরং তখন গতিশীলতার সুগন্ধে তাদের মস্তিস্ক ভরে ওঠে। প্রসঙ্গতঃ সকলেই জানেন-ঢাকের বাদ্য, মঙ্গল প্রদীপ এবং ওম শান্তি-এ তিনটি হল হিন্দু সামাজের পজার তিনটি আবশ্যিক উপকরণ। আর ‘নমোঃ তস্য ভগওয়াতো অরহোতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য’-এ বাক্যটি হল নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধদের একটি প্রিয় স্তুতি। উল্লেখ্য, বিগত মার্চ (১৯৮৮) মাসে ঢাকার বৃটিশ কাউন্সিল হলে উপরোক্ত পদ্ধতিতে তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। কিছুদিন পর্বে প্রেসক্লাবে একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম আলোচনাকারী হিসেবে। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমি। তখন এরূপ কয়েকজন ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী বলেছিলেন, তাহলে তো বাইবেল এবং গীতাও পাঠ করতে হয়, অন্যথায় সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উঠবে। কিন্তু জানিনা বৃটিশ কাউন্সিল হলের উক্ত সভায় কুরআন পাঠ না হওয়ায় সে অভিযোগ উত্থাপিত হল না কেন ? তাহলে কি ধর্ম নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক হওয়ার জন্য মুসলমানদের নিজেদের আদর্শ , সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে অমুসলিম আচরণ করা আবশ্যক ? তাহলেতো বৌদ্ধদেরও অবৌদ্ধ আচরণ এবং খৃষ্টানদেরও অখৃষ্টান আচরণ করতে হবে। কিন্তু কৈ তারা তো তেমন করছেন না ? তাহলে ময়ুর পুচ্ছ দাড়

কাকেরা ধর্ম নিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বলে অমন তড়পাচ্ছে কেন ?

ধর্ম নিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা বলতে যে তারা ইসলাম বিরোধ এবং ধর্ম নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক বলতে ইসলাম বিরোধী বোঝাতে চান সে কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে দৈনিক ইনকিলাবের উপ-সম্পাদকীয় কলাম (কাজির দরবার) থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি। তাহলে বিষয়টি বেশ স্পষ্ট হবে-

'ওবায়দিয়া মাদ্রাসা' নানুপুর, চট্টগ্রাম ৪৩৫১ থেকে জনাব আঃ রহীম মরহুম আবুল ফজল সম্পর্কে একটি সাধারণতঃ অজানা খবর দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে জনাব আবুল ফজল তওবা করেছিলেন।

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও এবং ইসলামী ধারায় জীবন যাপন করেও তিনি অসাম্প্রদায়িক ছিলেন-সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব কামাল উদ্দীন হোসেনের এই আপত্তিকর উক্তি সম্পর্কে গত ৭ই আগষ্ট এই কলামে যে আলোচনা করেছিলাম, সেই প্রসঙ্গেই জনাব আঃ রহীম ঐ খবর দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন মহল থেকে ইদানিং বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, সাম্প্রদায়িকতা বলতে ইসলাম বোঝায় এবং অসাম্প্রদায়িকতা বলতে ইসলাম বিরোধিতা বোঝায়। এই ব্যাপারে অনেকের মনে এতদিন যে অস্পষ্টতা ছিল সম্প্রতি অপর একজন বিচারপতি জনাব কে, এম, সোবহান তা সম্পূর্ণ দূর করে দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা করে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, অন্য কিছু নয়, ইসলামই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। কারণ তিনি বলেছিলেন যে, ইসলামী শাসন প্রবর্তনের দাবী জানিয়ে মাওলানা ভাসানীই স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাম্প্রদায়িকতা আমদানি করেন। জনাব কামাল উদ্দীন হোসেন এই ইসলাম বিরোধী অর্থেই আবুল ফজলকে অসাম্প্রদায়িক বলে অবিহিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি কি সত্যিই ইসলাম বিরোধী ছিলেন ? জনাব আব্দুর রহীম জানিয়েছেন, প্রথম জীবনে সীতাকুন্ড মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সাতকানিয়ার কেওচিরা গ্রামের আলেম

পরিবারের আলেম পিতার সন্তান জনাব আবুল ফজল ইন্তেকালের কিছুদিন আগে তাঁর ভাগিনা প্রখ্যাত আলেম জনাব ফুজাইলুলণ্ঢাহ সাহেবকে ডেকে পাঠান। তাঁর হাতে হাত রেখে এবং তাঁকে সাক্ষি রেখে নিজের লেখায় বা কথায় ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী কোনও কিছু প্রকাশ পেয়ে থাকলে সেজন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রকাশ করেন এবং খালেছ দেলে আলণ্ঢাহ পাকের দরবারে তওবা করেন। কোনও ইসলাম বিরোধীর পক্ষে কি এই আচরণ করা সম্ভব ? একমাত্র একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানই অনুভব করতে পারেন যে, জীবন সায়াহ্নে যখন তার স্রষ্টা মহাপ্রভূর সান্নিধ্যে ফিরে যাওয়াার সময় হয়, তখন এই দুনিয়ায় দায়িত্ব পালনের ত্রটি-বিচ্যুতির জন্য দ্বীন ভিখারির মত আকুল প্রাণে ক্ষমা প্রার্থনা করা একান্তই আবশ্যক।

কোন মুমিন নামধারী ইসলাম বিরোধী তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হয়তো এই প্রয়োজন না-ও অনুভব করতে পারেন। কিন্তু জনাব আবুল ফজল তাদের দল ভুক্ত ছিলেন না। সুতরাং ইসলাম বিরোধীরা তাঁকে দলে টানার চেষ্টা করে একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন। তাঁর ঐ তওবার খবর পেয়ে আশা করি এখন তারা লজ্জায় মুখ লুকাবেন।

লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে ধর্ম নিরপেক্ষতা কায়েমের নামে যে অভিযান শুর হয়েছিল এখন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার নামে সেই একই ইসলাম উচ্ছেদ অভিযান শুর হয়েছে। শুধু সাইনবোর্ড ও শেণ্ঢাগান বদল হয়েছে মাত্র। ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েমের সেই হুজুগের আমলে স্মরণ করা যেতে পারে যে, রেডিও-টেলিভিশনে কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামের সংগে যে ‘মুসলিম’ শব্দ ছিল তা মুছে ফেলা হয়েছিল। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা বোর্ডের মনোগ্রাম থেকে কুরআনের আয়াত -“রাব্বি ঝিদনী এলমা” (হে প্রভূ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও) এবং “একরা বিসমি রাব্বিকা” (পড় তোমার প্রভূর নামে) তুলে ফেলা হয়েছিল। আরও অগ্রসর হওয়ার আগে এই ধরণের সকল তৎপরতা একদিন আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইসলাম উচ্ছেদের সেই অসমাপ্ত কাজ এতদিন পরে এখন আবার নতুন

নামে নতুন উৎসাহে শুর করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্যণীয় যে, সেই ধর্মনিরপেক্ষতার হুজুগের আমলে যারা সক্রিয় ছিলেন এখন তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী হুজুগেও ঠিক সে মহলই আবার তৎপর হয়ে উঠেছেন। তাদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের নাম উলেণ্ঢখ করে আমার এক বন্ধু বললেন যে, তারা যাকে অসাম্প্রদায়িকতা মনে করেন সেই ইসলাম বিরোধিতার মারের চোটে জর্জরিত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তারা নিজেরাই একদিন ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পদ ফেলে রেখে পশ্চিম বঙ্গ থেকে পালিয়ে এসে পর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই পর্ব পাকিস্তান এখন স্বধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মানুষের ঈমান-আকীদা সেই আগের মতই আছে। তারা পাঞ্জাবীদের উচ্ছেদ করেছে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা ইসলামও বর্জন করেছে। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গ তো এখন অসাম্প্রদায়িকতার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং এখানে সেই অসাম্প্রদায়িকতা কায়েমের নিষ্ফল চেষ্টা না করে তারা নিজ গৃহে ফিরে যান না কেন? বন্ধুর এই প্রশ্নের আমি কোনও জবাব দিতে পারিনি, কেউ পারেন কি?

উলেণ্ঢখযোগ্য যে, এদেশে যারা কম্যুনিষ্ট বা সমাজতন্ত্রী বলে নিজেদের পরিচয় দেন তারাও ঐ কথিত অসাম্প্রদায়িকতা কায়েমের আন্দোলনে আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু তারা নিজেরা কি আসলে অসাম্প্রদায়িক ? আজীবন নিষ্ঠাবান সর্বত্যাগী কম্যুনিষ্ট জনাব আব্দুশ শহিদ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'আত্মকথা' গ্রন্থে (বর্ণধারা ঢাকা ১৯৮৯) হিন্দু কম্যুনিষ্ট ও মুসলিম কম্যুনিষ্ট সম্পর্কে তাঁর মল্যায়ন লিপিবদ্ধ করেছেন। হিন্দু কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন- 'সন্ত্রাসবাদী পার্টি থেকে আগত শতকরা ৯৫ জন নেতৃবৃন্দ এদেশের সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানদের চিন্তা, আচার- আচরণকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে অপারগ হয়েছেন। তারা সাম্প্রদায়িকতাকে এত যান্ত্রিকভাবে দেখেছেন যার ফল হয়েছে মারাত্মক। আমাদের সংখ্যালঘু পার্টি নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে মার্ক্সবাদী বলে যতই ঢাক-ঢোল পিটান না কেন নিজেদের

আচরণে তারা সে পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রমাণ, পার্টিশনের পর জেল থেকে বেরিয়ে ব্যাপক সংখ্যক বলতে গেলে শতকরা ৯৫ জন কমরেড কলকাতা চলে যান। তাদের এই হিন্দুস্দান বা ভারত প্রীতি এদেশের পার্টির বিরাট ক্ষতি করেছে। যারা জেলে বসে এদেশকে ভালবাসেন বলে দাবী করেছেন এবং কিছুতেই পর্ব পাকিস্দান ত্যাগ করবেন না বলে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তারাই আগে কলকাতার পথে পাড়ি জমিয়েছেন। আর মুসলিম জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে কমরেডদের ধারণা সম্ কর্কে তিনি বলেছিলেনঃ তৎকালে মুসলিম সর্বস্ব পার্টি নেতৃবৃন্দকে জনতা সাম্প্রদায়িক গোষ্টি বলেই জানত, পার্টি নেতৃবৃন্দ মুসলিম জনতার তো কথাই নেই। মুসলিম মধ্যবিত্ত বিপণ্ডবী হলেও তাকে সাম্প্রদায়িক মনে করতেন এবং সর্বত্রই সেই সাম্প্রদায়িকতার ভুত দেখতে পেতেন। তাদের এই জুলুম ভয় জনতার উপর বিশেষ করে মুসলিম জনতার উপর আস্থার অভাব থেকেই আসত। শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র এমনকি রবীন্দ্রনাথকে আমরা যে কারণে অন্য পাঁচ জনের মত সাম্প্রদায়িক বলি না অথচ তাঁরা কিন্দু তাদের সাহিত্যে মুসলমানদের সামনে আনতে পারেন নি। তেমনি আমাদের কমরেডগণ তত্ত্বগতভাবে অসাম্ দায়িকতার কথা বললেও মলতঃ তারা সাম্প্রদায়িকতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন নি।

জনাব আব্দুশ শহীদের এই বক্তব্যেও স্ ষ্টতঃই আর কোন টিকা-হাশিয়ার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি এই জ্ঞান আরহণ করেছেন তারও কোন বিকল্প নেই। এই পটভূমিকা মনে রেখে বর্তমানে বাংলাদেশে যারা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন করছেন তাদের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। তাদের মধ্যে একটি শ্রেণী আছে যারা সরাসরি কম্যুনিষ্ট এবং সেই ভাবেই তারা নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন। অপর শ্রেণীর লোকেরা কম্যুনিষ্ট নন কিংবা সেইভাবেই নিজেদের পরিচয়ও দেন না। কিন্দু কম্যুনিষ্টদের প্রতি তারা সহানুভূতিশীল, তাদের সঙ্গে উঠাবসা করেন এবং তাদের ভাষাতেই কথা বলেন। ফলে কমরেডদের মত তারাও ইদানিং সর্বত্র সাম্ দায়িকতার ভূত দেখতে অভ্যস্ হয়ে পড়েছেন এবং বাংলাদেশে যেখানে

সাম্প্রদায়িকতার কোন অস্তিত্বই নেই সেখানে সাম্প্রদায়িকতা আমদানির জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তারা নিজেরাই যে সাম্প্রদায়িক সে কথা তো জনাব আব্দুশ শহীদ সাহেবই বলেছেন। তাছাড়া কোনও বিশেষ ধর্ম বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি একমাত্র তাদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে বিদ্বেষ পোষণ করাও সাম্প্রদায়িকতা। এই অর্থে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের ঢালাওভাবে সাম্প্রদায়িক বলেছেন এবং বিশেষতঃ আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মত দেশে-বিদেশে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম ও রাজনৈতিক নেতাকে পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বলতে ইতস্ততঃ করছেন না, তারা নিজেরাই যে ঘোরতর সাম্প্রদায়িক তাতে আর কোনও সন্দেহ আছে কি ?

সুতরাং বাংলাদেশে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার স্বার্থেই এই নব্য সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠির অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

সবাই যখন নিন্দা-করছেন তখন সাবেক বিচারপতি জনাব কে. এম. সোবহানকে আমি মোবারকবাদ ও খোশ আমদেদ জানাচ্ছি। কারণ, 'সাম্প্রদায়িকতা' বলতে আসলে যে কি বুঝায় তা এতোদিন বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মত তিনিই সরলভাবে সহজবোধ্য ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। এমন কি আমার মত মুর্খের কাছেও ব্যাপারটি পানির মত পরিস্কার হয়ে গেছে।

তিনি বলেছেন-'পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়ে মাওলানা ভাসানীই স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাম্প্রদায়িকতার সত্রপাত ঘটান।' (দৈনিক বাংলা, ১০ই আগষ্ট, ১৯৮৯)। শেখ মুজিব ও শেখ মুনিরের চতুর্দশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি ঐ কথা বলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে একটি বিশাল মহল ইদানিং সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে খুব হৈ চৈ করছেন। সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের জন্য কমিটি করছেন, সভা করছেন, সেমিনার করছেন, মিছিল করছেন এবং এমনকি

কবিতার আসরও বসাচ্ছেন। আর একজন নেত্রী দেশের সর্বত্রই সাম্প্রদায়িকতা আবিস্কার করছেন এবং তার বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। তিনি আবার ঘন ঘন বিদেশে গিয়েও ঘোষণা করছেন যে, বাংলাদেশে এমন ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রাদর্ভাব হয়েছে যে সেখানে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কেননা যে কোন মুহূর্তে যে কোনও মানুষই ঐ মহামারী প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে। এই সরল বক্তৃতা-বিবৃতিতে আমরা সাধারণ মানুষেরা বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হয়েছি।

কারণ, সাম্প্রদায়িকতার যে নিন্দনীয় অর্থ আছে সেই অর্থে আমরা বুঝি যে, ধর্ম বিশ্বাস, বংশ পরিচয় বা গাত্রবর্ণের কারণে এক সম্প্রদায় কর্তৃক অপর সম্প্রদায়ের উপর জুলুম করাকেই সাম্প্রদায়িকতা বলা হয়। যেমন আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে সাম্প্রদায়িক হিন্দুগণ মুসলমানদের মসজিদ বন্ধ করে দিচ্ছে, গরু জবাই করতে বাঁধা দিচ্ছে, তাদের দোকান-পাট লুট করছে, ঘরবাড়ি জ্বলিয়ে দিচ্ছে এবং ঘনঘন দাঙ্গা বাঁধিয়ে তাদের পাইকারীভাবে খুন করছে।

ঐ একই দেশে ব্রাহ্মনগণ আবার হরিজনদের উপর একই ধরণের নির্যাতন চালাচ্ছে। কোনও হরিজন মন্দিরে প্রবেশ করলে কিংবা ব্রাহ্মণের পানি স্পর্শ করলে তাকে তার পরিবার-পরিজনের সামনেই হাত-পা বেঁধে জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারছে। দক্ষিন আফ্রিকা যাদের স্বদেশ সেই কালা আদমীদেরকে তাদের স্বদেশ ভূমিতেই বিদেশী ধলা আদমীরা পাখি মারার মত গুলি করে করে মারছে আর তাদের মরণ যন্ত্রণা দেখে শিকারের আনন্দে অট্টহাসি হাসছে। সভ্যতা ও গণতন্ত্রের দেশ বলে কথিত বৃটেনের রাজধানী-লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ধলা আদমীরা বাংলাদেশী কালা আদমীদের লঠিপেটা করছে এবং এমনকি খুনও করছে। এই সেদিনও ঐরকম লাঠিপেটার আরেকটি ছবি পত্রিকায় দেখেছি। বুলগেরিয়ার নাস্তিক কম্যুনিষ্টগণ লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে ঘরবাড়ি, ক্ষেত-খামার, ব্যবসা বাণিজ্য থেকে উৎখাত করে তুরস্কে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সেভিয়েত রাশিয়ায় খোদ যোশেফ স্ট্যালিন যে তিরিশ লক্ষ মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুকে গণহত্যা করে গণকবর দিয়েছিলেন

সেই খবর ও প্রমাণ এখনও পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যেও ইহুদীগণ লক্ষ-কোটি মুসলমানকে তাদের স্বদেশভূমী থেকে উৎখাত করে বছরের পর বছর ধরে তাবুতে বাস করতে বাধ্য করছে এবং সেই অস্থায়ী অরক্ষিত আবাসে প্রায় প্রতিদিনই হামলা চালিয়ে সেই অসহায় মানুষগুলিকে নির্বিচারে খুন করছে। আমরা সাধারণ মানুষেরা এই সকল আচরণ ও ঘটনাকেই এতদিন সাম্প্রদায়িকতা বলে বুঝে এসেছি এবং এই কারণেই বাংলাদেশে যখন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী আওয়াজ তোলা হয়েছে; তখন আমরা বিস্মিতও হয়েছি আবার বিভ্রান্তও হয়েছি।

বিস্মিত হয়েছি এ জন্যই যে, বাংলাদেশে কোথাওতো সাম্প্রদায়িকতার লেশ মাত্র নেই। সকল ধর্মবিশ্বাস, বংশপরিচয় ও গাত্রবর্ণের মানুষ এখানে সম্পূর্ণ শান্তি,সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মধ্যে বাস করছে। এই অবস্থা গোপন কিছু নয় কিংবা গোপন করার মত ব্যাপারও নয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিদ্বেষ বা বিরোধের মত কিছু হয়েছে এমন কোনও দাবী বা অভিযোগ কেউ কখনও করেননি। এমনকি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বয়ানবাজি করা যাদের প্রায় সার্বক্ষনিক পেশায় পরিণত হয়েছে, তারাও কখনও সময়-তারিখ এবং স্থান-পাত্রের নাম উল্লেখ করে কোনও ঘটনার বিবরণ দিতে পারেননি। তাতে একটি সত্যই প্রমাণিত হয় যে, এদেশে সাম্প্রদায়িকতা বলতে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। এই ব্যাপারে অন্ততঃ বাংলদেশ একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধিও বাংলাদেশে এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশংসা করেছেন। এই অবস্থা বিদ্ধমান থাকা সত্ত্বেও একটি বিশেষ মহল যখন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে হামেশা-হুংকার করেন তখন আমরা স্বভাবতঃই বিস্মিত হই।

আর বিভ্রান্ত হই এই কারণে যে, যারা ঐ বয়ানবাজি করেন, তারা কেউ জদা মিয়া পদা মিয়া রকমের লোক নন। তাদের মধ্যে আছেন রাজনৈতিক দলের নেতা, কবি-সাহিত্যিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা প্রাক্তন শিক্ষক, প্রাক্তন বিচারপতি, আইনবিদ প্রমুখ। অর্থাৎ,

সমাজের শীর্ষস্থানীয় মানুষ, যাদের প্রতি আমরা সাধারণ মানুষেরা চঃই আস্থা ও শ্রদ্ধা পোষণ করি। তারা যখন কোনও কথা বলেন, তখন আমরা বিনা ওজরে ধরে নেই যে, তারা সত্য ও সঠিক কথাই বলেছেন। কেননা তাদের মত উ চ শিক্ষিত, দায়িত্বশীল এবং সমাজের উ চতম আসনে অধিষ্ঠিত জ্ঞানী-গুণীজন যে অসত্য বা বেঠিক কিছু বলতে পারেন তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনা। সেই তারাই যখন বলেন যে, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতার বন্যায় পণ্ডাবিত হয়ে গিয়েছে, অথচ আমরা কেউ সাদা চোখে সেই বন্যার এক কাতরা পানিও দেখতে পাই না, তখন আমরা খুব বিভ্রান্ত হই-মহৎ ব্যক্তিদের কথা অবিশ্বাসও করতে পারি না, আবার নিজের চোখকেই বা অবিশ্বাস করি কেমন করে? আমাদের বিভ্রান্তির একটা অতিরিক্ত কারণ এই যে, তারা শুধু সাম্প্রদায়িকতা পর্যন্ত বলেন। সাম্প্রদায়িকতা বলতে কি বোঝায়, তার সংজ্ঞা কি, কারা সাম্প্রদায়িক, কিংবা কোন ধারণা, মতবাদ, আচরণ বা ঘটনা সাম্প্রদায়িক তা কখনও তারা ভেঙ্গে বলেন না। ফলে আমাদের বিভ্রান্তি আর দর হয়না, বহাল থাকে এবং তাদের প্রত্যেকটি বিবৃতি পড়ার পর তা আরও বেড়ে যায়।

এতদিনে সাবেক বিচারপতি জনাব কে. এম সোবহান আমাদের সকল বিস্ময় এবং সকল বিভ্রান্তি দর করে দিলেন। তিনি সকল আবরণ উন্মোচন করে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, কুরআন-সুন্নাহর আইন এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই হ ছে সাম্প্রদায়িকতা। তিনি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সাম্প্রদায়িক বলেছেন বলে ধরে নিয়ে যে সকল ব্যক্তি ও সংগঠন প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তারা একটি মারাত্মক ভুল করেছেন। আসলে তিনি মাওলানা ভাসানীকে সাম্প্রদায়িক বলেননি, তিনি যা বলেছেন তা হ ছে এই যে, যারা কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আইন এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী করে তারা সকলেই সাম্প্রদায়িক। সুতরাং মাওলানা ভাসানীই যে তাঁর আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্যস্থল এমন কিছু মনে করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। জনাব সোবহানের দেয়া সংজ্ঞা থেকে আর একটি স্বাভাবিক উপসংহার পাওয়া

যাচ্ছে এই যে, কোন মুসলমান যদি অসাম্প্রদায়িক হতে চায়, তাহলে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইসলাম বর্জন করে অমুসলিম হয়ে যাওয়া।

একজন সাবেক বিচারপতি, যিনি আবার মুসলমানও বটে (তিনি ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন বলে এখনও শোনা যায়নি) তিনি কুরআন-হাদীছ পড়েননি, পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান মদীনা-সনদ পড়েননি এবং সেই সংবিধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইহুদী-খৃষ্টান মেজরিটি মুসলিম মাইনোরিটি রাষ্ট্র এবং খেলাফতের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত নন এমন কথা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। তবে তিনি যে একটি অতিব প্রশংসনীয় কাজ করেছেন তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে আমাদের সকল বিস্ময় ও বিভ্রান্তি তিনি দূর করে দিয়েছেন। কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আইন এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এক কথায় ইসলামই যে সাম্প্রদায়িকতা তা আমরা এখন পরিস্কার বুঝতে পারছি। এই ব্যাখ্যার জন্য আমি তাকে আবার মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ থেকে মৌলবাদ উৎখাতের প্রথম ও গুরুতর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরই। তখন অবশ্য সাম্প্রদায়িকতা শব্দটিই বেশী ব্যবহার করা হত। কিন্তু মৌলবাদই হোক আর সাম্প্রদায়িকতাই হোক এই সকল শব্দ দিয়ে আসলে ইসলামের কথাই বুঝানো হত। এতদিন পর খোদ প্রেসিডেন্টের বক্তৃতায় সেই শব্দের ব্যবহার এবং সেই ধারণার প্রতিফলন দেখে অনেকের মনেই বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে।

কারণ যাঁর ব্যক্তিগত ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম ঘোষিত হয়েছে, সেই প্রেসিডেন্ট হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদের কথায় যে অমন কিছু থাকতে পারে তা তারা কল্পনাও করতে পারে না। স্মরণ করা যেতে পারে যে, গত ১৬ই আগষ্ট ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে হিন্দু প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তৃতা করতে গিয়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি বলেন, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে মৌলবাদীদের অপছন্দ করেন, তারা দেশের উন্নতিতে অনেক ক্ষতি করেছে, ইসলামকে রাষ্টধর্ম ঘোষণা করে মেজরিটি মানুষকে একটি দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং

মৌলবাদীদের বাংলাদেশের মাটি থেকে ক্রমান্বয়ে নির্মূল করা হবে।' (বাংলাদেশ টাইমস, ১৭ই আগষ্ট, ১৯৯০)। এখানে 'মৌলবাদী' শব্দটির একটি পরিস্কার ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কারণ নাস্তিক, কম্যুনিষ্ট, ইসলাম বিরোধী তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী মুসলমানের মত নামধারী তথাকথিত প্রগতিবাদী এবং ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণার বিরোধীগণ ঠিক এই শব্দটি কদর্থে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রবক্তাগণ রেডিও-টেলিভিশনে কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কুরআনের আয়াত মুছে ফেলে এবং এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ উৎখাত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল তার কথা আশা করি অনেকেরই মনে আছে। যা ইতিপূর্বে আমিও বলে এসেছি। কিন্তু ঐ যুদ্ধে আর একটা বড় শক্তি যে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল সে খবর সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন না। অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিষ্ট মিশন তখন বাংলাদেশের জন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল এবং তা ইংরেজী ভাষায় লিখিত আকারে তাদের কর্মীদের মধ্যে প্রচার করেছিল। তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয়েছিল- 'একটি নতুন জাতির জন্ম হয়েছে, তার নাম বাংলাদেশ। অতএব খৃষ্টের বাণী প্রচারের অপূর্ব সুযোগ এসেছে। কারণ মনে রাখতে হবে, ইসলাম আর এদেশে রাষ্ট্রিয় ধর্ম নেই, ছাত্র ও যুব সমাজে ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়েছে, জনগণের মনে চিন্তার স্বাধীনতা ও নব অনুসন্ধিৎসার আবির্ভাব হয়েছে, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে মুসলমানগণ মুসলমানদের হত্যা করেছে, ঐ যুদ্ধে খৃষ্টান যুবকগণ বাংলদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছে, খৃষ্টানগণ যুদ্ধপীড়িতদের আশ্রয় দিয়েছে। সুতরাং এখন মুসলমানদের খৃষ্টানরূপে ধর্মান্তরিত করার কাজ শুরু করতে হবে।

এমন সব জায়গায় কাজ করতে হবে যেখানে আগে কোনও খৃষ্টান ছিল না। যেমন জামালপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি। এইভাবে খৃষ্টবাদ প্রচার ও প্রসারের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে তা আমাদের অষ্ট্রেলীয় ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রদান করবে।' (বাংলাদেশে অমুসলিম মিশনারীদের তৎপরতাঃ আলহাজ এ. বি. এম.নুরুল ইসলাম কাউন্সিল ফর

ইসলামিক সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন্স, কলাবাগান, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠাঃ ৬৪-৬৫)।

সেই ১৯৭২ সালের পরিকল্পনায় ইতিমধ্যে কি ফল ফলেছে তার একটি বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। গত ২০শে আগষ্ট দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে জানা যাচ্ছে যে, ১৯৭২ সালে যেখানে মাত্র ১ লক্ষ খৃষ্টান ছিল সেখানে মিশনারীদের তৎপরতার ফলে এখন খৃষ্টানের সংখ্যা হয়েছে ২৬ লক্ষ। যারা মুসলমানের মত নাম ধারণ করা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত স্ব-জাতি স্ব-ধর্মীয়দের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে থাকেন তাদের তৎপরতার ফলেই অনেক মুসলমানগণ যে খৃষ্টান পাদ্রীদের সহজ শিকারে পরিণত হয় তাতে বোধ করি কোনই সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় যে, হিন্দু-বৌদ্ধ বা খৃষ্টানদের মধ্যে কাউকে স্ব-ধর্মীয়দের মৌলবাদী বা সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিতে দেখা যায় না। এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র মুসলিম সমাজেই দেখা যায়। একজন মুসলমান যখন অপর একজন মুসলমানকে ঐভাবে গালি দেয় তখন তা শুনতে পেয়ে অমুসলমানগণ নিশ্চয়ই অপার আনন্দ ও সন্তুষ্টি লাভ করে থাকে। কি আশ্চর্য ! গালিদাতা মুসলমানগণ তাতে কোনই শরম বা সংকোচ বোধ করেন না। অমুসলমানগণ যখন হাত তালি দিয়ে তাদের উৎসাহ দেয় তখন তারা তার মধ্যে নিজেদের কৃতিত্বের আলামতই দেখতে পান। আত্মঘাতী ভ্রাতৃঘাতি অস্যাঘাতটি তাদের নজরে পড়েনা ।

উল্লেখযোগ্য যে, সদ্য স্বাধীন এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ এই বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় সেই ১৯৭২ সালেই জনাব এ, কে , মোশাররফ হোসেন আখন্দ সংবিধান মুসাবিদা কমিটির সভায় সংবিধানের শুরুতে করুণাময় কৃপানিধান সর্বশক্তিমানের নামে' লিখে দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। বাক্যটি আসলে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" আয়াতের বাংলা তরজমা হলেও তৎকালীন ধর্ম নিরপেক্ষতা অর্থাৎ ইসলাম বিরোধিতার উত্তপ্ত মারমুখী পরিবেশে তিনি স্পষ্টতঃই 'আল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার না করে 'সর্বশক্তিমান' শব্দটি ব্যবহার করে ছিলেন। কিন্তু ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত ঐ

কমিটির সভায় প্রস্তাবটি সরাসরি নাকচ হয়ে যায়। (বাংলাদেশ গেজেট, ১২ই অক্টোবর, ১৯৭২) পরে সংবিধান সংশোধন করে যখন শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম লেখা হয় (এবং অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ধর্ম নিরপেক্ষতার স্থলে আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং সমাজতন্ত্রের স্থলে সামাজিক সুবিচার লিখিত হয়) তখন থেকেই আওয়ামী-বাকশালী ও নাস্তিক-কমুনিষ্ট মহল মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করা হয়েছে বলে তার স্বরে চিৎকার করতে থাকে। সভা- সেমিনারের আয়োজন করে তারা খোদ ইসলামকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। যেহেতু ইসলামপন্থী কোনও কোনও ব্যক্তি বা দল স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিল সেহেতু ঐ ব্যক্তি বা দলকে দোষারোপ না করে সকল দোষ খোদ ইসলামের গর্দানে চাপিয়ে দিয়ে তারা সরবে ঘোষণা করতে থাকে যে, ইসলামী আদর্শ, ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক কোনও রাজনীতি এদেশে চলতে পারবে না। কিন্তু স্মরণ করা যেতে পারে যে, তখন কোনও কোনও কম্যুনিষ্ট ব্যক্তি ও দলও স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা এবং হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্ক্সিষ্ট, লেনিনিষ্ট) মুক্তিযুদ্ধকে ‘দুই কুকুরের লড়াই’ বলে অভিহিত করেছিল এবং মুক্তি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধ করেছিল। এমন কি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তারা সেই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়নি এবং দীর্ঘ তিন বছর যাবত আব্দুল হকের নেতৃত্বাধীন দলের নাম ‘পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টি’ বহাল ছিল। কিন্তু তথাপি সেজন্য কেউ কম্যুনিজমকে দোষারোপ করে এমন কথা বলেনি যে, কম্যুনিষ্ট আদর্শ ভিত্তিক কোনও রাজনীতি এদেশে চলতে পারবে না। কিন্তু ইসলাম পন্থীদের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকার জন্য খোদ ইসলামকেই যদি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বলে অভিহিত করা হয় তাহলে একই কারণে কম্যুনিজমকেও একইভাবে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বলে অভিহিত করা হবে না কেন? বাংলাদেশের ইসলাম বিরোধী মহল থেকে এখনও এই প্রশ্নের কোনও জবাব পাওয়া যায়নি। পরবর্তিকালে বর্তমান সরকারের আমলে যখন ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা

দেয়া হয় তখন ঐ মহলটি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, তখন আমি এই কলামে আমার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে তাদের বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতির দফাওয়ারি জবাব দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। আরও স্মরণ করা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে প্রতিহত করার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়েই তখন হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ নামে একটি সাম্প্রদায়িক দল গঠিত হয়েছিল এবং তারা এখনও সক্রিয় রয়েছে।

তাছাড়া বামপন্থীদের কবিতা উৎসব এবং সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট সহ বিভিন্ন মঞ্চ ও পাটাতন থেকেও রাষ্ট্রধর্মের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোধগার করা হয়। সাবেক বিচারপতি জনাব কে. এম. সোবহান যিনি নিজে হিন্দু, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে ঐ সাম্প্রদায়িক দলের একজন নিয়মিত বক্তায় পরিণত করেছেন, তিনি ক্রমাগতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসাপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। এই সেদিনও পিরোজপুরে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত এক সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন-'ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা' ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। কিন্তু পরে সাম্প্রদায়িকতার সচনা করা হয়। শাসনতন্ত্রের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করিয়া মৌলবাদের বীজ বপন করা হইয়াছে। এই অবস্থা প্রতিরোধ করিতে হইবে।' (দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা মার্চ, ১৯৯০)। আর গোপালগঞ্জের এক সমাবেশে বক্তৃতা করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা বলেছেন-'সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা মুছে ফেলে বাংলদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে। (দৈনিক ইনকিলাব, ২১শে আগষ্ট, ১৯৯০)। অর্থাৎ, রাষ্ট্রধর্ম বিরোধীতা এখনও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম ইসলামে আসলে কি আছে? ঢাকায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে সিরাতুন্নবী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ নিজেই বলেছেন, 'ইসলাম এমন একটি জীবন পদ্ধতি দিয়াছে যাহা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সম-অধিকার নিশ্চিত এবং একটি শোষণ ও দোষ ত্রুটিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা খুলিয়া দেয়। ইসলামকে রাষ্টীয় ধর্ম ঘোষণার সাথে সাথে জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে

ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হয় নাই বরং শুরু হইয়াছে। (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৮৮)। যারা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়, মৌলবাদী বলতে যদি তাদের কথা বোঝানো হয়ে থাকে, তাহলে কোন্ মৌলবাদীদের নির্মূল করার প্রয়োজন দেখা দিতেছে তা বোধ করি খোলাসা হওয়া দরকার। (কাজীর দরবার)।

আসলে ধর্মহীন এবং ইসলাম বিরোধী যে, তাকেই যে তারা ধর্ম নিরপেক্ষ বলতে চান সেটা আর খোলাসা হওয়ার দরকার নেই, এটা প্রতিদিনেই স্ পষ্ট হয়ে গেছে। একারণেই মোগল সম্রাট আকবরকে ধর্ম নিরপেক্ষতার বাস্ব প্রতিমর্তি মনে করা হয়। গত বৎসর নয়া দিলণ্টীতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বাস ভবনে 'আকবর দি গ্রেট' নামক একখানি বইয়ের প্রকাশনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে জনাব গান্ধী আকবরকে 'মহান ধর্ম নিরপেক্ষ সম্রাট' বলে অভিহিত করেন। (দৈনিক ইনকিলাব, ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪)। অথচ সবাই জানেন আকবর একজন সুদক্ষ শাসক, কুশলী কুটনীতিবীদ ও বিজ্ঞ জ্ঞান সাধক হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম বিরোধী বহু বিধি-বিধান সংযোজন করে 'দ্বীনে ইলাহী' নামক একটা জগাখিঁচুড়ি ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। আকবরকে 'ধর্ম নিরপেক্ষ সম্রাট' বলে অভিহিত করার কারণ ঐ ইসলাম বিরোধিতা এবং তার অভিনব ধর্ম প্রবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং ইসলাম থেকে দরে সরে যাওয়ার কারণেই তার ঐ প্রশংসা করা হয়েছে এবং এ কারণেই আকবরকে 'আকবর দি গ্রেট' বলে ভষিত করা হয়েছে। আমার মতে 'আকবর দি গ্রেট' না বলে তাকে আহাম্মক দি গ্রেট বলাই শ্রেয়। কারণ প্রকাশ্যে কুরআন পুড়িয়ে, শকর পজা করে, সর্যের পজা করে, কপালে তিলক এঁকে, আজান দেয়া ও নামায পড়া নিষিদ্ধ করে, নিজেকে সেজদা করার হুকুম জারি করে, দাঁড়ি রাখা ও খতনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে; সদ, জুয়া, মদ হালাল করে, সালামের প্রচলিত রীতি 'আসসালামু আলাইকুম' বদল করতঃ 'আলণ্টাহু আকবার জালণ্টা জালালুহু' চালু করে, (উলেণ্টখ্য, সম্রাটের নাম ছিল জালালুদ্দীন আকবর। সালামের এই বাক্যটি সেই আঙ্গিকেই প্রবর্তন করা হয়) গর , ভেড়া, ছাগল, মহিষ ও উট নিষিদ্ধ

করতঃ বাঘ ও ভালুকের গোশত খাওয়া হালাল ঘোষণা করে- যে লোক সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের এই কিম্ভুতকিমাকার পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল তাকে ‘আহাম্মক দি গ্রেট’ ছাড়া আর কি বলা অধিক যুক্তিযুক্ত হতে পারে বলুন? আজ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা তাহলে কি ধর্ম নিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতার নামে ধর্মের এই কিম্ভুতকিমাকার সমন্বয়ের আহম্মকী করতে চান ? তাহলে কিন্তু আমার মত ভবিষ্যতের মুখ পোড়া লেখকরাও আপনাদেরদেরকে আহাম্মক খেতাব দিতে কসুর করবে না। যে যত বেশী ইসলামকে বর্জন ও বিদ্রূপ করতে পারবেন, তিনি তত বড় ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারবেন, আর সে অনুপাতেই তিনি আহাম্মকি খেতাব লাভ করতে পারবেন। এত বড় মর্যাদার (?) খেতাব যারা লাভ করতে চান তারা করুন; তাতে আমাদের কোন ঈর্ষা নেই। আর বিধর্মীদের ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়ার জন্য তাদের নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করা অবশ্যক নয় বরং তারা যে মুসলমান নন এটাই তাদের ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এই তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা সূরা কাফিরূন-এর আয়াত ‘লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন’ কে বেশ ফলাও করে প্রচার করে থাকেন। কিন্তু এ আয়াতে সামাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার বিপরীত বলা হয় কোথায় ? বা তাদের আচরিত ধর্ম নিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতার জগাখিচুড়ি রূপটিই বা এ আয়াত থেকে কিভাবে ইজতিহাদ করা হল ? এ আয়াতের সাবলীল অর্থ যা তা হল-‘তোমাদের দ্বীন তোমাদের এবং আমাদের দ্বীন আমার’ অর্থাৎ, প্রত্যেকের দ্বীন ও ধর্ম স্বতন্ত্র, এর মাঝে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা কাম্য নয় বা তা হতে পারে না। এ আয়াতের শানে নুযূলও এ অর্থই নির্দেশ করে। তবে হ্যা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি অঙ্গন পরিচালিত হবে ইসলামী মূল্যবোধ অনুসারে, সে কথা স্বতন্ত্র, এ আয়াতে তা বলা হয়নি। তার বাস্তব নমুনা দেখিয়ে গেছেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের জীবনে। সুতরাং ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা পবিত্র আয়াত দ্বারা জনগণকে এরকম শুভংকরের ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকবেন বলে আশা রাখি কিংবা

কুরআনের আয়াত না বুঝে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আহম্মকির মাত্রা না বাড়ালেই ভাল হয়।

বস্তুতঃ এরা ইসলামকে প্রাইভেট রাখতে চায়। তাহলে অশণ্টীলতা, পাপাচার ও গর্হিত কাজগুলোকে জাতীয়করণ ও আন্তর্জাতিকীকরণ সহজ হয়ে পড়ে, এক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শকে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা হলে অশণ্টীলতার জাতীয়করণ বা আন্তর্জাতিকীকরণের পক্ষে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজ সেবা

অশণ্টীলতাকে বৈধ করার জন্য আরো অনেক ধরণের সত্য কথার আশ্রয়ও তারা নিয়ে থাকে। যেমন ‘সমাজসেবা’ একটা কথা, কথাটা সত্য। এই ‘সমাজসেবা’ -এর প্রয়োজনীয়তা বা গুরত্বও বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা এবং প্রকৃত সমাজ সেবীও যে রয়েছেন অনেক তাও সত্য। তবে কিছু কিছু মতলবী লোক এই সত্যের আড়ালে তাদের খারাপ মতলব সিদ্ধি করে থাকেন। পাড়ায় পাড়ায় মহলণ্টায় মহলণ্টায় যুবকদের অনেক ক্লাব রয়েছে; সেখানে সারাক্ষণ দাবা, জুয়া, কেরামবোর্ড খেলা, ক্যাসেটের সুপারহিট গান শোনা বা মাস্তানীর নানা রকম প্রশিক্ষণ চলে। আবার সমাজ সেবার নামে লোকদের কাছ থেকে তারা জোর পর্বক চাঁদা আদায়ও করে থাকে। এখানে সমাজ সেবামলক কি কাজটা হয় তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

এই সমাজ সেবার নামে মতলব সিদ্ধির মহড়া দেখলাম এবারে ৮৮-এর ভয়াবহ বন্যার সময়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা দর্গত এলাকায় গিয়ে নিজের দলের গুণগান প্রচারে কসুর করেননি মোটেই। হোকনা তাদের বিতরণকৃত ত্রাণ সামগ্রী ছিটেফোঁটা কিংবা মোটেই না। অনেক দলকে আবার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের কয়েকদিন পর্বেই তাদের দলীয় ব্যানার পাঠিয়ে দর্গত এলাকায় নিজের দলের প্রচার করতে দেখেছি। ঠিক একই কারণে ফটোগ্রাফারদের উপস্থিতি ছাড়া তারা দান করতে নারাজ। এতো গেল রাজনৈতিক দলের ব্যাপার-স্যাপার। ব্যাক্তিগতভাবেও অনেকে এধরনের সমাজ সেবা করেছেন। তাই

স্বাভাবিকভাবেই তাদের মতলব নিয়ে বিপাকে পড়তে হয় বৈকি! হয়তো তাদের মতলব ঠিক কিংবা ঠিক না। কারও নিয়তের উপর হামলা করতে চাই না। কিন্তু যখন দেখি বড় বড় অফিস আদালতে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য ত্রাণ তহবিলে দানের এই ক্রেডিটকে কাজে লাগানো হয়, তখনই কেমন যেন তাদের মতলব সম্ র্কে সন্দিহান হয়ে পড়ি [৫৯]

যাই হোক, আমি বলছিলাম 'সমাজ সেবা'- নামে বদ মতলব সিদ্ধির কথা। যেমনটি আরও করে থাকে সমাজ সেবার নামে বিভিন্ন বেসরকারী বিদেশী সংস্থা এনজিও (নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন) গুলো। সমাজ সেবার জন্য এ সমস্ বিদেশী সংস্থাগুলোকে অনুমোদন দেয়া হয়, কিন্তু তাদের মতলব কি তা সবার জানা আছে এবং তাদের কার্যকলাপেও তা প্রমাণিত হ ছে। আর এভাবেই তারা সমাজ সেবার নামে মানুষকে বোকা বানা ছে।

জানিনা সমাজ সেবার সংজ্ঞা সমাজ বিজ্ঞানীরা কি দিয়ে থাকেন। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিরাতো পতিতাবৃত্তিকেও সমাজসেবা বলে চালিয়ে দি ছেন। পতিতারা নাকি সমাজের সেফটি ভাল্ব- (অর্থাৎ,এমন যন্, যা বাষ্ নির্মাণ পাত্রে স্বয়ংক্রিয় হয়ে অতিরিক্ত চাপ কমিয়ে দেয়) অর্থাৎ, সেফটি ভালব যেমন বাষ্ নির্মাণ পাত্র থেকে অতিরিক্ত চাপ কমিয়ে দেয়, তেমনি ভাবে পতিতারাও সমাজ থেকে আকাম-কুকামের অতিরিক্ত প্রেসারকে কমিয়ে দেয়, ওরা আছে বলেই সমাজে যত্রতত্র আকাম-কুকাম হতে পারে না, যাদের প্রয়োজন তারাই সেখানে চলে যায়। অতএব ওরা সমাজের সেবাই করছে বলতে হয়। ওরা না থাকলে সমাজের সর্বত্র এই কুকাম ছড়িয়ে পড়ত। ওরা আছে বলেই পাপ একটা গন্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকছে। এদিক থেকে ওদের দ্বারা সমাজের কল্যাণই সাধন হ ছে বলতে হবে। অতএব পতিতাবৃত্তি সমাজ সেবা বলে আখ্যা পাবে না কেন ? এই হ ছে পতিতাদের সেফটি ভালব পন্থীদের যুক্তি। তাদের বিশ্বাস-এই পেশা সামাজিক ভারসাম্যতা রক্ষার ব্যাপারে একটি গুর ত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কক্ষের দষিত গরম বাতাস বের করার জন্য যেমন কক্ষে এগজষ্ট ফ্যান লাগানো হয়, পতিতাগুলোও নাকি তেমনি ক্রাইম এগজষ্ট জেনারেটর। মোক্ষম যুক্তি বটে! তাহলে এমন

মহৎ সমাজ সেবার কাজে তাদের বোন, ভাগ্নী, স্ত্রীদের নামান না কেন ? আজই তাদের নেমে পড়া ভাল নয় কি ? সামাজিক ভারসাম্যতা রক্ষার এহেন গুরত্বপর্ণ দায়িত্বে কালক্ষেপণ রীতিমত অন্যায় হবে নয় কি ? আর সরকারেরও এ ধরনের সমাজ সেবামলক প্রতিষ্ঠানকে শুধু লাইসেন্স আর্থিক আনুকুল্য প্রদান করা উচিৎ এবং তা নৈতিক কর্তব্য। ালে তাতে বিরাট প্রতিফল (?) পাওয়া যাবে। সরকার যেন ভুলেও এই পেশার প্রতি অবজ্ঞা বা তা বন্ধের উদ্যোগ না নেন। বরং বেশী বেশী করে ক্রাইম এগজষ্ট জেনারেটর (পতিতালয়) ফিট করন, যাতে সেই জেনারেটর সমাজ থেকে পাপের দষিত চাপ কমিয়ে (?) দিতে পারে।

১৯৮১ সালের ২রা জুলাই, বৃহস্পতিবার। আমাদের পার্লামেন্টে পতিতালয় উচ্ছেদ সংক্রান্ত একটি ইস্যুর উপর দীর্ঘ দু'ঘন্টা ব্যাপী একটি মজার আলোচনা হয়। 'অপসংস্কৃতির বিভীষিকা' নামক একটি বই থেকে তার বিবরণ তুলে ধরছি-

"মল প্রস্তাবক মিঃ প্রফুলণ্ঢ কুমার শীল বললেনঃ পতিতাবৃত্তি মাতৃত্বের অবমাননা। এ সমাজ নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। নৈতিকতার অধঃপতন থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে অসামাজিক কাজে লিপ্ত পতিতালয়গুলোকে উচ্ছেদ করে দিয়ে তাদের পনর্বাসিত করে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী (প্রস্তাবক ব্যতীত অপর নয় জনের) প্রথম ব্যক্তি বললেনঃ এটা পৃথিবীর একটি আদিম পেশা, আইন করে বন্ধ করা যাবে না। কোন দেশ বন্ধ করতে পারেনি। আমি ১৯৪৭ সালে আমার নিজ শহর থেকে পতিতা পলণ্টী উচ্ছেদ করে এখনও অনুতাপ করছি। এটা সমাজের সেফটি ভাল্‌ব। পতিতাবৃত্তি উঠিয়ে দিলে সমাজের সেফটি ভালব নষ্ট হয়ে যাবে। আগে চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করন। এটা চিত্ত বিনোদনের বিকল্প।

তিনি জাঁদরেল নেতা ছিলেন। ইসলাম আর মুসলমানদের ব্যাপারে সুযোগ পেলেই তিনি দু'কথা বলতেন। সেই নেতা আর ইহজগতে নেই। সেদিনের এই বক্তব্যে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, আইন করে পতিতাবৃত্তি বন্ধ করা যাবে না। পৃথিবীর কোন দেশ বন্ধ

করতে পারেনি। অতএব আমাদের উচিৎ এ ব্যাপারে যেন আগে না বাড়ি। যেভাবে চলছে সেভাবে চলুক। পতিতাদের সংস্ র্শে এসে যুবকরা চিত্ত বিনোদন কর ক। এর ফলে সমাজের কিশোরী যুবতীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না। পতিতালয়গুলো সেফটি ভালব হিসেবে কাজ করছে। সুতরাং পতিতালয়গুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অপরিহার্য। এই জ্ঞানী জাঁদরেল নেতা অবশ্য জানতেন কিনা যে, পৃথিবীর যে সব চিত্ত বিনোদনের সব রকমের সুলভ ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে, সেসব দেশে স্বনামে এবং বেনামে পেশাদার এবং সৌখিন পতিতাদের সংখ্যা শতে নিরানব্বই। সীমাহীন চিত্ত বিনোদনের সুবিধা মানেই হল সীমাহীন পাপে ডুবে যাওয়া, যা উন্নত সমাজগুলোতে বিদ্যমান। যৌন বিকৃতি আর চিত্ত বিনোদন কি এক কথা ? পতিতালয় উ ছেদের আগে সমাজে প্রয়োজনীয় চিত্ত বিনোদনের অবাধ ব্যবস্থা করার কথা বলে তিনি কি যে বুঝাতে চেয়েছিলেন তা কিন্তু আমি বুঝিনি। পতিতা ভোগকে যদি চিত্ত বিনোদন মনে করা হয়, তাহলে এর বিকল্প বিনোদন তো ঐ প্রকৃতিরই বিনোদন হতে পারে। তিনি কি তাই বুঝাতে চেয়েছিলেন ?

অন্য এক দলপতি বললেন, 'ওদের কথা ছাড়ুন, ধানমন্ডি-গুলশান-বনানীতে কি ঘটছে তা আগে দেখে আসুন।' এই নেতার বক্তব্যের মল সুর ছিল এই-ধানমন্ডি, গুলশান,বনানীতে যারা প্রগতির নামে সৌখিন পতিতাগিরী করছে, তাদের দমন করার ব্যবস্থাটা না নিয়ে গরীব পতিতাদের পেশাটা বন্ধ করা উচিৎ নয়। অর্থাৎ, অভিজাত পতিতাদের নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব, তাই শর্ত সাপেক্ষে গরীব পতিতারাও আন-ডিস্টার্ব থাকনা ?

তৃতীয় আলোচনাকারীর বক্তব্য ছিল এই-পতিতাবৃত্তি একটি স্বীকৃত পেশা। অর্থাৎ তিনি মনে করেন, এই স্বীকৃত পেশাকে অস্বীকার করা অন্যায়, আইন বিরোধী ও অবৈধ। তার বক্তব্যের মল সুর ছিল এই- চলছে গাড়ি চলতে থাকুক, আমরা শুধু দেখতে থাকি।

চতুর্থ আলোচনাকারীর অভিমত-মেয়েদের সমালোচনা করে লাভ নেই, পুর ষরাই এই পেশার পৃষ্ঠ-পোষকতা করছে। অর্থাৎ, তিনি বুঝা ছেন অন্য কায়দায়, অন্য ফর্মলায়। ফর্মলাটা হল এই- পুর ষরা না গেলেইতো আপনা থেকে পতিতারাও পতিতাবৃত্তি ছেড়ে দেবে।

এক মহিলা সদস্য বললেনঃ লাইসেন্স বিহীন হাজার হাজার পতিতা সমাজে ঘুরে বেড়াছে। এজন্য দায়ী সম্ পূর্ণরূপে পুরুষ শাসিত সমাজ। এই সংসদ সদস্যাও মূল আলোচনা থেকে সজ্ঞানে দূরে সরে পড়লেন এবং পুরুষদের উপর মনের ঝালটা ঝেড়ে মহিলা শাসিত সমাজের পক্ষে ওকালতী করলেন। আসল কথা কিন্তু এত কথার ফাঁক

পড়ে গেল।

ষষ্ঠ সদস্যের বক্তব্যঃ যাকাত বোর্ডের মাধ্যমে যাকাত সংগ্রহ করে পতিতাদের পুণর্বাসন করা উচিত। তিনি উছেদের পক্ষে কথা বললেন তবে খুব দূরে থেকে।

সপ্তম সদস্যের মন্তব্যও ছিল উছেদ বিরোধী।

অষ্টম সদস্য ছিলেন উছেদের পক্ষে, আর মন্ত্রী (আলোচনায় অংশগ্রহণ কারী মোট দশজনের একজন) ছিলেন মাঝামাঝিতে।

শেষ অবস্থা ছিল এই, শীল মশাই একা কিছুক্ষণ লড়লেন, অতঃপর ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তার বিরুদ্ধে প্রায় সকলেই ছিলেন। একা একা আর কতক্ষণ লড়াই করা যায়। অতঃপর বেচারা শীল মশাই সকলের চাপে পড়ে প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন। তিনি বাইরে এসে মন্তব্য করে ছিলেন যে, 'সকলেই যখন পতিতাদের প্রেমে দিওয়ানা, তখন আমি একা একা চিৎকার করে কি হবে ? এ পেশা যদি এতই মহৎ হয়ে থাকে, তাহলে এ পথে তাদের বোন-ভাগ্নীকে নামালেইতো হয়।

প্রস্তাবটি ধামাচাপা দেয়ার জন্য অর্থাৎ মুখ রক্ষার জন্য ১৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটি ৩১ ডিসেম্বর (১৯৮১) এর মধ্যে রিপোর্ট পেশ করার কথা ছিল। কিন্তু সেই রিপোর্টের মুখ আজও কেউ দেখেনি।"

কিন্তু কথা হল পতিতাবৃত্তি যদি সত্যিই সমাজ সেবামূলক মহৎ পেশা হয়ে থাকে, তাহলে পুলিশ কেন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে খদ্দের সহ পতিতাদের গ্রেপ্তার করে, যা মাঝে মধ্যে পত্রিকায় ছবিসহ আমরা দেখতে পাই ? আর কেনই বা তাহলে সরকার সম্প্রতি পতিতাবৃত্তি বন্ধের জন্য তার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের চিন্তা ভাবনা করছেন। এত বড় মহৎ পেশা বন্ধের মত অন্যায় কাজ সরকার মহাশয় করবেন! তাহলে কি ৮১ সালের ১৪ সদস্যের কমিটি এতোদিনে তাদের

রিপোর্ট পেশ করেছে ? নাকি পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাওয়ার পর সুড়সুড়ি মলক যুক্তিও উঠে গেছে। আর তাই পতিতাবৃত্তির বিরূদ্ধে আইন প্রণয়নের এই চিন্তা ভাবনা শুধু হয়েছে।

বস্তুতঃ নৈতিকতাই হল সমাজের সেফটি ভালব। এই ভালব শুধু পাপের অতিরিক্ত চাপই নয় পাপকেই সমলে বন্ধ করে দিতে পারে। পক্ষান্তরে পতিতাবৃত্তি সেফটি ভালবতো নয়ই বরং মল ে ৬৩ ভালবকেই সে ফিউজ করে দেয়। যে পতিতাবৃত্তি সমাজে সিফিলিস, গণোরিয়া এমনকি এইড্স-এর ন্যায় দরারোগ্য ও মারাত্মক যৌন ব্যাধির সম্প্রসারণ ঘটায়, সেটাকে সমাজের সেফটি ভালব বা সমাজ সেবা একমাত্র বিকৃত মস্তিষ্ক লোকই বলতে পারে। আসলে যৌন সুড়সুড়ি বা ভোগের নিচাপ যখন মস্তিষ্কে চেপে বসে, তখন মস্তিষ্ক বিকৃতই হয়ে যায়। সেই অসুস্থ মস্তিষ্ক তখন ভেবে-চিন্তে কিছু করার বা বলার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাই তখন পতিতাবৃত্তিকে 'সমাজ সেবা' বলার ন্যায় অসংলগ্ন কথাও বলে ফেলে।

শিল্প সংস্কৃতি

আবার ক্ষেত্র বিশেষ কিছু কিছু বেহায়া-বেলেল্লাপনা ও নগ্নতাকে শিল্প, সংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত করা হয়। প্রচলিত এই সংস্কৃতির সংজ্ঞা বা তার অর্থ কি তা আমি ঠিক বলতে পারব না। সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীরাই কেউ কারর সাথে একমত হতে পারেননি। তাই হয়তো কোন রসিক লেখক বলেছিলেন, "সমাজ বিজ্ঞানীদের সংখ্যা যত, সংস্কৃতির সংজ্ঞাও তত।" বড় বড় মাথা ওয়ালাদের সংস্কৃতি বিষয়ের উপরে লেখা বই-পুস্তক পড়লে রীতিমত হাঁপিয়ে উঠতে হয়। কি যে তারা বলেন, তা তারাই ভাল বুঝেন। কারো সংগে কারো মিল নেই। কতগুলো সুন্দর সুন্দর শব্দ আর বাক্য সাজিয়ে যা তারা পেশ করেন, তার মাথামুন্ডু কিছু বুঝে আসে না। ইংরেজী 'কালচার' শব্দেরই বাংলা তরজমা করা হয়েছে সংস্কৃতি। সুসাহিত্যিক আবুল মনসুর তাঁর 'বাংলাদেশের কালচার' গ্রন্থে লিখেছেন- "কালচার এর সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। এত কঠিন যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পুরা একশ' বছরের দীর্ঘ মুদ্দতে

ইউরোপ-আমেরিকার দুইজন পন্ডিতও এই ব্যাপারে একমত হইতে পারে নাই।” এই যখন নামী-দামী পন্ডিতদের অবস্থা তখন আমার মত চুনোপুটির পক্ষে সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব কিভাবে ? তবে বুদ্ধিজীবিদের ন্যায় শব্দের মারপ্যাঁচ না দিয়ে মোটা বুদ্ধির মানুষ হিসেবে মোটামুটিভাবে আমরা যা বুঝি তা হল-দীর্ঘদিন ধরে নিদৃষ্ট ভৌগলিক ৬৪ কার সমাজ জীবনের যে রীতিনীতি, আচার-আচরণ, অভ্যাস ও আদব-কায়দা গড়ে উঠে তা-ই সে সমাজের সংস্কৃতি বলে পরিচিতি লাভ করে। বলাবাহুল্য মানুষের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, অভ্যাস ও আদব-কায়দা গড়ে উঠে তারই বিশ্বাস এবং জীবন সম্ কর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে। ‘খাও দাও ফুর্তি কর’ ডিসকো ডিসকো হুড়োহুড়ি, ডিসকো ডিসকো পোশাক- আশাক ও চালচলন আর মক্ষিরাণীদের মাতাল করা নগ্ন নৃত্য তাদের সংস্কৃতি হবে বৈ কি ? আর সুবিধাবাদ যাদের জীবনের মল দর্শন তাদের যেখানে যেমন সেখানে তেমন নীতির অনুশীলন এবং হাওয়ার তালে তালে নেচে নেচে চলাই হবে তাদের সংস্কৃতি। আস্তিকের সংস্কৃতি আর নাস্তিকের সংস্কৃতি, সাধু আর শয়তানের সংস্কৃতি, কলীমুদ্দীন ও সুনিলদত্তের সংস্কৃতি কখনও এক হবে না। সম্ভবতঃ এই পার্থক্যের কথা ভুলে গিয়ে সবার সংস্কৃতিকে এক করার প্রচেষ্টায় একটা খিচুড়ী মার্কা সংজ্ঞা দিতে গিয়েই যত গোলমালটা বেঁধেছে। আর এই সুযোগে যার যেটা ই ছা সেভাবে সেটাকে সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দি ছে। সংস্কৃতি এখন যেন বাজারী নানার মত- যার যেমন ই ছা ইয়ার্কী তামাশা করছে। কিংবা সরকারী খাস জমির মত- যার যেমন ই ছা দখল করছে, বেগুন ক্ষেত করছে, এ যেন হাওর বিল কিংবা গাঙ্গের পানির মত- যার যেমন ই ছা গোসল করছে। নইলে আমাদের এই নব্বই ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত দেশে যেসব জিনিস কে আমাদের সংস্কৃতির নামে চালিয়ে দেয়া হ ছে তা সম্ভব হত না।

সংস্কৃতির মাধ্যমেই একটা জাতির ইতহাস, ঐতিহ্য, তার মন-মানস ও চিন্াধারা সম্ কর্কে অবগতি লাভ করা যায়। এবং এরই মাধ্যমে জাতির অতীতকে তার ভবিষ্যতের কাছে তুলে ধরা যায়। অতএব এ অর্থে একটি জাতির সংস্কৃতির সংরক্ষণ, তার স্বযত্ন লালন-পালন, সংস্কৃতির অনুশীলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা

অনস্বীকার্য। একটি জাতি সত্ত্বার বিকাশ সাধন ও তার উন্নতি-অবনতির মল্যায়নের ক্ষেত্রে এ সংস্কৃতির গুর ত্ব অপরিসীম। সংস্কৃতিরূপ সভ্যতার নির্যাসকে অশ্রদ্ধা করার কোন উপায় আছে কি ? কিন্তু অধুনা যেসব বিষয়কে সংস্কৃতির নামে চালিয়ে দেয়া হ ছে, তাকে নিছক সত্য কথার আড়ালে বদ মতলব সিদ্ধি ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নেই। আজকাল প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাই 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান', 'সাংস্কৃ ৬৫ সন্ধ্যা' ইত্যাদি আয়োজনের কথা। আবার কখনও বা আনন্দ মেলা, শিল্প প্রদর্শনী ইত্যাদি নামেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কম বেশী আমরা সকলেই জানি এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিছক যৌন আবেদনমলক অশণ্টীল ও নগ্ন নারী নৃত্য পরিবেশন এবং নাট্যানুষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই হয় না। শিল্প প্রদর্শনীর নামে সারা রাত চলতে থাকে নগ্ন নৃত্য আর নানা অসামাজিক কার্যকলাপ। আর এসব যেহেতু সুকুমার শিল্পবৃত্তি, সুস্থ সংস্কৃতি (?) চর্চা ও ঐতিহ্যবাহী লোক যাত্রা, অতএব সরকারের ঘাড়ে কয়টা মাথা যে এসবকে অনুমোদন দেবেন না ? কাজেই এসবের পৃষ্ঠপোষকতাই সরকারের নীতি হওয়া উচিত (?) তাইতো এসব সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যেই এখন গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও নাট্য গোষ্ঠী যার শিল্পী সদস্যরা উগ্র মেকআপ মেখে রঙ্গিন আলোয় নেই গোছের এক চিলতে ফিনফিন কাপড় কোনমতে কোমরে-বুকে জড়িয়ে অঙ্গ দুলিয়ে দুলিয়ে যুবক-তর ণদের মনকে সংস্কৃত করে তোলেন। সরকার মহোদয়ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অতিথিদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে আমাদের মা-বোনদেরকে তাদের সামনে উলঙ্গ করিয়ে থাকেন। কিন্তু বুঝিনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে গোটা দেশকে এরকম কীর্ত্তন ঘরে রূপান্র ও মা-বোনদের ইজ্জত আব্র লুটিয়ে দেয়ার মহড়া আমাদের সংস্কৃতি হল কিভাবে।

আজকাল আবার আমরা এই সংস্কৃতির নামে প্রাণহীন, বোধশক্তিহীন বর্ষ, বর্ষা, বসন্, পৌষ প্রভৃতিকে বরণ করে থাকি। সংস্কৃতির নামে এই প্রকৃতির পজা মুসলমানদের সংস্কৃতি হল কিভাবে তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না । শীতের মওসুম এলে পৌষ মেলা ও পৌষ পার্বনের নামে যে সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করা হয়, সাবেক কালে এ সব মেলায় কুস্তি খেলাধুলা যেমনঃ হা-ডু-ডু, কাবাডি, ঘোড়-

দৌড় ইত্যাদির আয়োজন করা হত। তাছাড়া বাঁদর নাচ, ছোট-খাট সার্কাস , যাত্রা ,থিয়েটার ইত্যাদিরও ব্যবস্থা নাকি থাকত। কিন্তু কালের অগ্রগতির সাথে সাথে অন্যান্য সব কিছুর মত পৌষ মেলারও চেহারা ছুরত পাল্টে গেছে। হালে এসব মেলায় নারী -পুরষ , তরণ-তরণী ও কিশোর-কিশোরীদের যে জমজমাট ভিড় দেখা যায়-তার একটা বিশেষ ৬৬ গও নাকি এখানেই। হালের পৌষ মেলায় নতুন নতুন যেসব উপকরণ সংযোজন হয়েছে সেটাই মুলতঃ এই আকর্ষণের কারণ। আজকে এসব শিল্প সংস্কৃতি সম্বলিত আনন্দ মেলাকে নাকি অনেকাংশে তুলনা করা যায় কোন পতিতালয়ের সাথে। কারণ প্রবেশ তোরণ থেকে শুর করে যাত্রা, থিয়েটার, যাদু, পুতুল নাচ, সার্কাস এবং অনুরূপ অনুষ্ঠানগুলোতে অসামাজিক তৎপরতার অংশটাই থাকে বেশী। সম্প্রতি রূপগঞ্জে অনুষ্ঠিত একটি পৌষ মেলা সম্ কর্কে একটি দৈনিকে যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তাতে লেখা হয়েছে যে, মেলায় প্রদর্শিত যাদু প্রদর্শনীতে দর্শকদের আকৃষ্ট করার জন্য তাদের দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে দুইজন সুন্দরী যুবতী। এটা নিন্দেহে নোংরা এলাকার তৎপরতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এবং মেলায় প্রদর্শিত যাত্রায় চলছে নর্তকীদের যৌন উত্তেজনাকর নাচ ও গান। যাদুর নামে প্রতারণা করে সেখানে দেখানো হছে প্রায় ডজন খানেক নগ্ন নৃত্য। তা ছাড়া দর্শক আকর্ষণ করার জন্য মেলার গেট ও টিকিট কাউন্টারে ৩-৪ জন করে যুবতী দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। সার্কাসেও চলছে একই ধরণের ধিংগী নৃত্য। সেই সংগে আছে মদ, জুয়া ও নীল ছবির প্রদর্শনী। এসব দেখে শুনে মনে হবে যে, এ মেলা তো মেলা নয় হীরামতি কিংবা টানবাজারের মেলা নিশ্চয়ই।

এইভাবে শিল্প সংস্কৃতির নামে মৌসুমী উৎসবে চলছে বেহায়া বেলেলণ্টাপনার মহড়া। এছাড়া সিনেমা সংস্কৃতি, টেলিভিশন সংস্কৃতি সহ ডজন ডজন তরতাজা সংস্কৃতিতো রয়েছেই, যাতে মারপিট, ধুমধাড়াক্কা, তরণীদের ধিংগীপনা, যৌন সুড়সুড়ি, ভাঁড়ামী সংলাপ, প্রেমলীলা ছাড়া মুখ্যতঃ সার কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই ভাড়ামী, নাটুকেপনা আর সুড়সুড়িমলক সংস্কৃতিই মুসলমানদের সংস্কৃতি ? আমাদের পর্ব পুরষদের আমলে পুরো দেশটাই কি একটা রঙ্গমঞ্চ ছিল

কিংবা নৃত্যশালা ? নয়তো এসব আমাদের সংস্কৃতি হলো কি ভাবে ? কিংবা কখন থেকে সংস্কৃতির অঙ্গনে এসবের অনুপ্রবেশ ঘঁটল ? হিন্দু সমাজ যদি এগুলিকে তাদের সংস্কৃতি বলে বরণ করে নেয়, তাহলে তা সংগত হতে পারে। কারণ, তাদের ঐতিহ্যই এমন। স্বয়ং তাদের দেবদেবীদের ইতিহাসই এ জাতীয় রোমান্সে ভরপুর। উদাহঃ ৬৭ হিন্দুদের প্রধান তিনজন ভগবান হল- ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব। সন্ধ্যা তর্পনাদি ছাড়া প্রত্যহ তারা যে শিব লিঙ্গের পজা এবং 'শালগ্রাম' শিলারূপী গোল পাথরের পজা করে থাকেন তার ইতিহাস এরূপ-ঋষী পত্নীদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঋষীগণ অভিশাপ দিয়েছেন বলেই মহাদেবের লিঙ্গপাত হয়েছিল (দেবী ভগবত, নবম স্কন্দ, ৫৯৮পৃষ্ঠা) । এখান থেকেই লিঙ্গ পজার প্রবর্তন হয়। তাছাড়া বাণলিঙ্গ (উভয় লিঙ্গের যুক্ত অবস্থা) পজার কাহিনী ন্রিূরূপ-এক সময় ভগবান মহাদেব যখন তার পত্নী পার্বতীর সাথে মিলিত হন, তখন মহাদেবের প্রমত্ত যৌন উত্তেজনার ফলে পার্বতী মরণাপন্ন হন এবং প্রাণ রক্ষার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে থাকেন। এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সুদর্শন চক্রের দ্বারা উভয় লিঙ্গকে কেটে দেহ থেকে বি ছিন্ন করতঃ পার্বতীর প্রাণ রক্ষা করেন এবং দেহ থেকে বি ছিন্ন করা লিঙ্গের সেই অবস্থা ও স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য প্রবর্তন হয় এই বাণলিঙ্গ পজার। আর শ খচুড়ের স্ী তুলশীর সাথে ব্যভিচার করার ফলে তুলশীর অভিশাপে ভগবান বিষ্ণুকে গোলাকার পাথরে পরিণত হতে হয়েছে এবং শালগ্রাম নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটেছিল বলে ঐ পাথরের নাম হয়েছে 'শালগ্রাম শীলা।' বিষ্ণু পাথরে পরিণত হওয়ার পরে দেবতাদের ভয়ে তুলশীদেবী গাছ হয়ে ঐ শীলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। পরে দেবতাগণ সবই জানতে পারেন এবং ঘোষণা করেন যে, প্রত্যহ পজার সময় এই শীলার বুকে এবং পৃষ্ঠে তুলশী পাতা সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় ভগবান বিষ্ণুর পজা সিদ্ধ হবে না। (স্কন্দ পুরাণ, নাগর খন্ডম, ৪৪৪১ পৃঃ ১-১৬ শেণ্ঢাক)।

হিন্দু শাস্ের বর্ণনা অনুযায়ী (পদ্ম পুরাণ, ষষ্ঠ খন্ড- ৬৯০ পৃঃ)যে ব্যক্তি প্রত্যহ অহল্যা, দ্র পদী, কুন্ি, তারা এবং মন্দোদরী- এই পঞ্চ

কন্যাকে স্মরণ করে, তার মহাপাপ নাশ হয়ে থাকে। মহাপাপ নাশিনী এই পঞ্চ কন্যার মধ্যে অহল্যা ও দ্র পদীর মোটামুটি পরিচয় নিম্নরূপ-

অহল্যা হল গৌতম মুনির স্ত্রী। সদ্য স্নাতা এবং আর্দ্র বস্ত্র পরিহিতা অবস্থায় আশ্রমে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে গৌতমশিষ্য দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। আর্দ্র বস্ত্রের আবরণকে ভেদ করে উদ্দাম যৌবনা অহল্যার রূপ লাবণ্য বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ফুটে উঠায় ইন্দ্র দেবের পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে; তিনি গুর পত্নী-অহল্যার সতীত্ব হরণ করেন। ত্রিকালজ্ঞ গৌতম মুনির কাছে একথা অজ্ঞাত থাকে না ; তার অভিশাপে অহল্যা প্রস্তরে পরিণত হন, আর ইন্দ্র দেবের সারা দেহে সহস্র যোনির উদ্ভব ঘটে। এটা দ্বাপর যুগের ঘটনা। সুদীর্ঘ কাল পরে ত্রেতাযুগে ঈশ্বরের অবতার রূপে শ্রী রামচন্দ্র আবিভর্তূ হন। পদস্পর্শে অহল্যার পাষাণত্ব অপনোদিত হয়।

আর দ্র পদী হল-কুর বংশীয় রাজা পান্ডুর পাঁচ পুত্র বিখ্যাত পঞ্চ পান্ডব যুধিষ্ঠির, অর্জুন প্রভৃতি পাঁচ ভ্রাতার পত্নী। পাঁচ ভাইই একত্রে দ্র পদীকে স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করতেন।

মহাদেবের পুত্র হল কার্তিক। মহাদেব স্বীয় পত্নী পার্বতীর সাথে রমন কার্যে রত থাকা কালে অকস্মাৎ সেখানে দেবগণের আবির্ভাব ঘটায় তিনি গাত্রোত্থান করেন, ফলে বীর্য মাটিতে পতিত হয়। পৃথিবী তা ধারণে অক্ষম হয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। অগ্নি কর্তৃক বীর্য শরবনে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তা থেকে সেখানে এক শিশু জন্ম লাভ করে। কৃত্তিকাগণ কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায় তার নাম রাখা হয় কার্তিকেয় বা কার্তিক। উক্ত কার্তিক কি কারণে ময়রের সাহায্যে পলায়ন করেছিলেন, ময়র-ময়রী কি কারণে মুখে মুখে মিলিত হয়, কার্তিকের কলাবউ কেন হল ইত্যাদি সম্পর্কে পুরাণ মহাভারতাদিতে যেসব ঘটনার বর্ণনা রয়েছে তা লজ্জাবশতঃ এখানে তুলে ধরা সম্ভব হল না।

আর মাত্র একটি ঘটনা- প্রজাপতি দক্ষের একশত পাঁচটি কন্যার মধ্যে সর্ব জ্যেষ্ঠা-সতীর বিবাহ হয়েছিল শুলপানি (শিব-মহাদেব) এর সাথে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু সহ প্রায় সকল দেবতাই এই বিবাহ উপলক্ষে হাটকেশ্বর তীর্থে সমবেত হয়েছিলেন এবং দক্ষের অনুরোধে ব্রহ্মা বিবাহের পৌরহিত্য করেছিলেন।

যজ্ঞানুষ্ঠানকালে বেদীতে উপবিষ্ঠা অবগুণ্ঠনবতী সতীর প্রতি ব্রহ্মার দৃষ্টি পতিত হলে চতুরানন (চারটি মুখ বিশিষ্ট) ব্রহ্মা সকলের অজ্ঞাতে সতীর সর্বশরীর দর্শন করেন। কিন্তু অবগুন্ঠনের জন্য মুখমন্ডল দর্শনে ব্যর্থ হন। কৌশলে কার্যোদ্ধারের জন্য তিনি যজ্ঞ-কুন্ডে কাঁচা কাষ্ঠ নিক্ষেপ করতে থাকেন। ফলে প্রচন্ড ধোঁয়ায় চারিদিক আ ছন্ন হয়ে পড়ে এবং বেদীর উপরে উপবিষ্ট সকলে ধোঁয়া থেকে চোখকে নিরাপদ জন্য চোখ বন্ধ করেন। বলাবাহুল্য- ব্রহ্মা এই সুযোগেরই প্রতিক্ষায় ছিলেন। সুযোগ বুঝে অবগুন্ঠন উন্মোচন করতঃ তিনি সতীর মুখমন্ডল দর্শন করেন। উলেণ্ঢখ্য যে, সর্বাঙ্গ দর্শন করা থেকেই তিনি কামাতুর হয়ে পড়েছিলেন। এখন মুখমন্ডল দর্শনে অবস্থা চরমে উপনীত হওয়ায় বীর্য স্খলিত হয়ে বেদীর উপর পতিত হয়। ব্রহ্মাও সাথে সাথে বালি দ্বারা বীর্যগুলি ঢেকে ফেলেন। কিন্তু বররূপী মহাদেবের দিব্য দৃষ্টির কাছে তা গোপন থাকে না। নিজের স্ত্রীর উপর ব্রহ্মার এই কামাতুর দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই মহাদেবকে ক্রোধান্বিত করে তোলে। তিনি অভিশাপ দিতে উদ্যত হন। অবশেষে ব্রহ্মার ক্ষমা প্রার্থনায় ক্রোধ প্রশমিত হয়। তবে বীর্যকে তিনি ব্যর্থ হতে না দিয়ে তৎসংশিণ্ঢষ্ট বালি সমহকে তিনি ‘মুনিতে’ পরিণত করেন। আর এমনি ভাবে সহস্র মুনির উদ্ভব ঘটে এবং বালি থেকে উদ্ভুত বিধায় তাদের নাম রাখা হয় ‘বালখিল্য মুনি’। (আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলামঃ আবুল হোসেন ভট্টাটার্য)।

এমনিভাবে হিন্দুদিগের দেবদেবী সম্ কেঁ যৌন সুড়সুড়িমলক অশণ্ঢীল ও নাটুকে বহু ঘটনাই পৌরাণিক গ্রন্থসমহে উলেণ্ঢখ রয়েছে। তবে এগুলো তাদের দৃষ্টিতে কোন দোষণীয় ব্যাপার নয়। কারণ এসব হল দেব-দেবীদের লীলাখেলা। এর রহস্য বোঝার সামর্থ ভক্তদের কোথায়? তাই স্বর্গে গিয়েও দেবতারা যখন উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি নামের বেশ্যাদের দ্বারা মনোরঞ্জন করেন তখনও তা দেবতাদের লীলাখেলা বলে আখ্যায়িত হয়। যদিও সব লীলাখেলাই এক নয় বা সবটাই প্রশংসার দাবি রাখে না। কুদরতের লীলাখেলা আর যৌন লীলাখেলাকে এক করা কিন্তু ঠিক নয়। একটার দ্বারা ভবলীলা সাঙ্গ হয় আর অন্যটার দ্বারা জগতের উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্ভবতঃ এই পার্থক্যের কথা স্বে ছায় ভুলে যাওয়ার ফলেই এমন সব অশণ্ঢীল কান্ড-

কারখানাকেও লীলাখেলা বলে চোখ কান বুজে ভক্তি সহকারে মেনে নেয়া সম্ভব হয়। তা নিক তারা মেনে নিক, অশণ্টীলতায় ডুবে থাকে থাকুক তাতে আমাদের পাকা ধানে মই লাগবে না। এগুলো তাদের ঐতিহ্য। এগুলোকে তারা সংস্কৃতি বলে চালাক, সংস্কৃতির বাজারে এগুলোর কেনাবেচা খুব তারা কর ক তাতেও আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই-

তু নিজেকে মুসলমান ও ইসলামপন্থী বলে দাবী করার পর যারা এইসব সুড়সড়িমলক অশণ্টীলতা ও বেহায়াপনাকে সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দিতে চান, তাদের উদ্দেশ্য নিয়েই যত বিপাকে পড়তে হয়।

লীলাখেলা

হিন্দুরা যেমন দেব-দেবীদের অশণ্টীল ও সুড়সুড়িমলক কান্ড-কারখানাকে দেব-দেবীদের লীলাখেলা বলে চালিয়ে দি ছে, এক শ্রেণীর অন্ধভক্ত মুসলমানরাও তার চেয়ে কম যা ছে না। এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ী প্রতারক ও ভন্ড পীর, ফকির, খাজাবাবা-দয়ালবাবাদের দরবারে যে নাচ গান, ঢলাঢলি ও মাতামাতির মত আদি রসের সর্বনাশা খেলা চলছে, এমনকি মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম প্রভৃতিও যেখানে হরদম চলছে, সেগুলিকে একদল অন্ধ ভক্ত বাবাদের লীলাখেলা বলে চালিয়ে দি ছে। আর ভক্তিতে গদগদ হয়ে তাদের কাছে দোয়া চাইছে, সম্ দ চাইছে, পকেট উজাড় করে তাদের কাছে ধন-সম্ দ ঢালছে। এমনকি বিবেক বুদ্ধির মাথা খেয়ে শত শত নারী দেহদান পর্যন্ করছে। আর এই পীর বাবারা আধ্যাত্মিক সাধনার নামে এইসব অপকীর্তি অবলীলায় চালিয়ে যা ছে বা যাওয়ার সুযোগ পা ছে। আধ্যাত্মিক সাধনা ব্যতীত আলণ্টাহকে পাওয়া যাবে না, “অন্তশুদ্ধির জন্য গুর র সান্নিধ্য লাভ করতে হবে, গুর -ভক্তি বিনে মুক্তি নেই” ইত্যাকার দর্শন প্রচার করে তারা ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে।

উপরোক্ত কথাগুলো কিন্তু সত্য, আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইসলামী জীবন বিধানে জাহেরী ও বাহ্যিক হুকুম-আহকাম বাস্বায়ন, যেমন-নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায় করা, হালাল উপায়ে উপার্জন করা, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, শরাব পান, যিনা ব্যভিচার ইত্যাদি হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন ;

তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক বিধি-বিধান যেমন ঈমান, ইখলাস, তাক্বওয়া, সবর, শুকর, তাওয়াক্কুল, কানায়াত, ইতায়াত প্রভৃতি অর্জন এবং দুনিয়ার লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, কাম, ক্রোধ, গর্ব, অহংকার প্রভৃতি চারিত্রিক ও আখলাকী দোষগুলি বর্জন তথা আত্মশুদ্ধির নিমিত্তে যে আধ্যাত্মিক সাধনা করতে হয় তারও তেমনি প্রয়োজন রয়েছে। এরই সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও হাতে নাতে প্রশিক্ষণের জন্য এমন একজন অভিজ্ঞ লোকের সান্নি ৭১ সাহচর্য গ্রহণ করতে হয়; যিনি নিজে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন, এ সাধনায় উৎকর্ষতা অর্জন করেছেন এবং যিনি অন্য মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমহ চিহ্নিত করে খোদা ও তাঁর রাসলের নির্দেশিত পন্থায় সেগুলি সংশোধনের পথ নির্দেশ করতে সক্ষম। বলাবাহুল্য-এ অর্থে পীর-মুরীদীর ধারা চালু রয়েছে। দুনিয়ার দিকে দিকে ইসলামের প্রচার, প্রসার এবং শিরক-বিদ্আত ও কুসংস্কারের বিরূদ্ধে সংগ্রাম করে ইসলামের নব জাগরণ সৃষ্টির পেছনে এহেন পীর বুযর্গ তথা শায়খে তরীকতদের অবদান সর্বজন বিদিত। আফ্রিকার গহীন জংগলে, সাহারা, গোবিতে, সাইবেরিয়ার তুষারাবৃত অঞ্চলে, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপরাজ্যে এমনকি আমাদের এই উপমহাদেশেও এদের দ্বারাই দ্বীন ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ সুমহান সিলসিলা অদ্যাবধি তার গতিতে চালু রয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি বরং আরও পর্ব থেকেই আধ্যাত্মিক সাধনার শ্লোগান দিয়ে, পীর-মুরিদীর নামে এক শ্রেণীর খাজাবাবা ও দয়ালবাবারা যে কান্ড-কারখানা শুরূ করেছেন তাকে সত্য কথার আড়ালে বদ মতলব সিদ্ধি ছাড়া আর কিছু বলার গত্যন্তর নেই। পীর- মুরিদীর নামে চলছে বিনা পুঁজির রমরমা ব্যবসা। আর লাভজনক এই ব্যবসা যেন হাত ছাড়া না হয় সে জন্য পীরের বংশের মর্খ পুত্র, ভাই-ভাতিজা ও জামাইরাও লম্বা পিরহান গায়ে দিয়ে মাথায় পাগড়ী বেঁধে পীর বনে যাচ্ছে। এমন কি ফারায়েজ সত্রে পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারার মত গদী নিয়ে কাড়াকাড়ি, প্রয়োজনে কোর্ট-কাছারি পর্যন্ত ছুটাছুটি চলছে। ঠিক এর পাশাপাশি পীর আউলিয়াদের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাকে পুঁজি করে রাস্তার পাশে লাশহীন মাজার বানিয়ে শিরনির নামে পয়সা আদায়ের ব্যবসাও চলছে চুটিয়ে। আর কম বেশী সকলেরই জানা আছে

- এসব মাজার ও পীরদের আখড়ায় এমন কোন অপকর্ম নেই যা সংঘটিত হয় না-ওখানে মদ আছে, গাঁজা, ভাং, আফিম আছে, নারী আছে, উলঙ্গ নাচের সুযোগ আছে, ঢলাঢলি মাতামাতির মওকা আছে, গান বাদ্যের আসর আছে। আর এসব সুযোগ আছে বলেই এক শ্রেণীর মানষ এসব আখড়ায় গিয়ে ভিড় জমায়। তা না হলে আলণ্ঢাহ কে ৭২ য়ার উদ্দেশ্যই যদি হবে, তাহলে যারা আলণ্ঢাহ ও রাসলের বাণী কুরআন-হাদীছ পড়েছেন, জেনেছেন, বুঝেছেন, কোন খাঁটি পীরের দরবারে থেকে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন ; তাদের কাছে না গিয়ে তারা এসব মর্খ দয়ালবাবা খাজাবাবাদের কাছে যায় কেন ? কুরআন-কিতাব পড়ার খোশ কিসমত তাদের না হলেও আলণ্ঢাহর দেয়া বিবেক তো রয়েছে। তা দিয়ে তো বুঝা যায় যে, যেনা ব্যভিচার করে আলণ্ঢাহকে পাওয়া যায় না। গাঁয়ের মূর্খ সলিমদ্দী, কলিমদ্দীও অনায়াসে বলতে পারবে যে, বেগানা মেয়েলোকদের দিকে তাকানো নিষেধ, পর পুর ষের সাথে যৌনাচার মহাপাপের কাজ। কাজেই 'দেহ-মন , জীবন, যৌবন, গুর র চরণে সব কর দান' -এই দর্শন যে বাবা গুর রা পেশ করেন তারা যে নিতান্ই ভন্ড তা কার র বুঝতে বেগ পাওয়ার তো কথা নয় ? অতএব দুই দুই চারের মতই স্ ষ্ট যে, নিজের খাহেশ, প্রবৃত্তির তাড়না আর যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্যই খাজাবাবারা এসব আখড়ায় আসর জমান ও তার চেলা চামুন্ডুরা সেখানে কিলবিল করেন। আর গুর ভক্তি, আধ্যাত্মিক সাধনা, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি কথাগুলো কপচানো হয় শুধু মাত্র নিজেদের অপকর্ম গুলিকে ঢাকা দেয়ার জন্য।

এক শ্রেণীর ভন্ড পীর-ফকীর তাদের এসব কর্মকে বৈধতার লেবাস পরানোর চেষ্টাও করে থাকেন। তারা বলে থাকেন কুরআন ত্রিশ পারা নয়, চলিণ্ঢশ পারা। তারা বলেন যে, দশ পারা আছে আমাদের কাছে, আর ত্রিশ পারা আছে মৌলবীদের কাছে...। হাকীকত, গোপন তত্ত্ব ঐ দশ পারার মধ্যেই রয়েছে। মৌলবী সাহেবরা কেবল ঐ ত্রিশ পারা নিয়েই কচুরী পানার মত ভেসে বেড়াচ্ছে, আসল ভেদ আমরাই পেয়েছি। তাদের বক্তব্য হল, ঐ দশ পারা লেখাজোখা নেই, ওগুলো সিনায় সিনায় চলে আসছে। তাদের সেই কল্পিত দশ পারার গুপ্ত ভেদগুলি বড়ই ঘৃণিত ও ন্যাক্কার জনক। তার মধ্যে একটা ভেদের কথা

নাকি নিরূপঃ মেয়েদের যৌনাঙ্গ একটা বয়ে যাওয়া নদীর মত (তাইতো তাদের ঋতুস্রাব হয়)। অতএব মরা, পঁচা, দর্গন্ধময় কোন জিনিসও যদি নদীতে ফেলা হয় তাহলে যেমন নদীর পানি নাপাক হয় না ; ঠিক তেমনি পীর বাবাজীরাও কোন মুরিদ বা অন্যের স্ত্রীর যৌনাঙ্গে বীর্যপাত করলে তা নাপাক হবে না। কারণ ওটা বহতা নদীর মত। তাদের কল্পিত দশ পারায় আরও একটা গোপন ভেদ নাকি আছে যা নিরূপঃ শর্ ৭৩ কোন জায়গার নখ, চুল কাটা যাবে না, মাথায় চুলে বা দাড়িতে জটা হয় হোক, জটার অধিকারী হওয়া বরং সৌভাগ্যের বিষয়। তারা বলেন রাসল (সঃ) মেরাজে গিয়েছিলেন তখন কি তিনি ক্ষুর, চির নি, নাপিত সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ? তাহলে নখ, চুল কাটার বা চির নি দিয়ে চুল দাড়ি আচড়াবার কি দরকার ? তারা বলেনঃ "আলণ্ঢাহর নবী যখন মেরাজ থেকে ফিরে এসে সাহাবীদের কাছে তা ব্যক্ত করেছিলেন তখন ক্ষুর, কাঁচির অভাবে তার নখ, চুল বড় হয়ে গিয়েছিল; চির নি ব্যবহার না করায় তাঁর চুলে, দাড়িতে জটা বেঁধে গিয়েছিল।" কিন্তু আমরা বুঝি না রাসলের কোন সাহাবীতো এমন তথ্য বর্ণনা করলেন না। আলণ্ঢাহর নবীর কোন কিছুইতো তাঁর সাহাবীরা গোপন রাখেন নি। আর এত বড় একটা কান্ড ঘটে গেল, চুল দাড়িতে জটা ধরে গেল অথচ তার সাহাবীরা তা কেউ দেখতে পেলেন না ; আর এই ভন্ড ফকীররা সব দেখে ফেলল। তা ছাড়া আলণ্ঢাহর রাসলতো অতি অল্প সময়ের মধ্যে মে'রাজ থেকে ফিরে এসেছিলেন, এখানে তার ক্ষুর কাঁচির কি প্রয়োজন ছিল তাও তো বুঝলাম না। আমরা জানি, আলণ্ঢাহর রাসল ঐ সময় কোন মেয়েলোক বা খাবার-দাবারও সাথে নিয়ে যাননি। তাহলে ফকিরদের এসবও তো একেবারে বন্ধ করে দেয়া দরকার। কিন্তু এ সবের বেলায় ফকিরদের তাল ঠিকই আছে। আর নারীর ব্যাপারে তারা যে দর্শন পেশ করলেন, সে হিসেবে পীর বাবাজীর স্ত্রীওতো অন্যের জন্য হালাল হওয়া উচিৎ। কিন্তু এ বেলায় দেখা যায় তাদের দাঁড়ি সাতাশ।

কিছুদিন পর্বে পত্র-পত্রিকায় ভন্ড বাবাদের কু-কীর্তি নিয়ে বেশ লেখালেখি হয়েছিল। স্ ষ্টতঃই বাবাদের তখন দুর্দিন যা ছিল। কিন্তু বাঙ্গালী চরিত্রের হুজুগী ধারায় কিছুদিন পরই আবার সেসব লেখালেখি নেতিয়ে পড়ে। তবে 'মুক্তিবাণী' নামক একটি পাক্ষিক পত্রিকায় দেখেছি

নিয়মিত ভন্ড পীরদের বির দ্ধে লেখা হয়, ভাবখানা যেন এমন-এ সব লেখা না হলে পত্রিকার ভাতই হজম হয় না। কিন্তু যখনই আবার দেখি ঐ পত্রিকাতে হর-হামেশা কম্যুনিজমের স্তুতিবাদ গাওয়া হয় তখনই মনে হয় ভন্ড পীরদের বির দ্ধে তাদের এই লেখা 'কথা সত্য, মতলব খারাপ' বই কিছু নয় । ভন্ড পীরদের বির দ্ধে তাদের এই নিয়মিত ৭৪ থাকায় ভাবখানা এটাই প্রকাশ পায় যে, সারা দেশটাই বুঝি ভন্ডপীরে ভরা। ভাল কোন পীর বা হক্কানী আলেমই যেন আর নেই। এতে করে এক পর্যায়ে ইসলামপন্থী তথা গোটা ইসলামের প্রতিই সব না হোক কিছু পাঠকের মন বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়তে পারে। আর এটাই ঐ পত্রিকাওয়ালাদের কাম্য।

যুক্তি

'কথা সত্য, মতলব খরাপ' শীর্ষক সুদীর্ঘ লেখায় পাঠকবৃন্দ একটা বিষয় নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, তাহল- প্রত্যেকেই তার মতলব সিদ্ধির জন্য কোন না কোনভাবে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। কোন ধোপে না টিকুক যে যুক্তি তবুও তার আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। কারণ যুক্তির আড়ালে মতলব সিদ্ধির পদ্ধতিটা খুবই আয়াস নিরপেক্ষ। যে কোন ধরনের মতলবই হোক না কেন তার পশ্চাতে একটা যুক্তি দাঁড় করানোই যায়। মনমত কয়েকটা কথা সাজাতে পারলেইতো যুক্তি হয়ে গেল। যেমন পীর বাবাজীদের যুক্তি দ্বারা শুধু শিষ্যদের স্ত্রীই নয় ; ই ছ করলে মা, খালা, বোন, শাশুড়ী সকলকেই সাবাড় করা যায়। কয়েক বৎসর পর্বে কোন একটা পশ্চিমা দেশে উলঙ্গ বাদী আন্দোলন শুর হয়েছিল, নারী-পুর ষ সকলকেই উলঙ্গ হয়ে চলতে হবে। পোষাক পরি ছদের এই উৎকট ঝামেলার কোন প্রয়োজন নেই। এই ছিল তাদের দাবী। বদ্ধ পাগলের প্রলাপের মত এমন একটা প্রকৃতি বির দ্ধ দাবীকেও তারা যুক্তির দ্বারা দাঁড় করাতে চেয়েছিল। মোটামুটি ভাবে তাদের কয়েকটা যুক্তি ছিল নিুরূপঃ

(১) উলঙ্গভাবে নারী-পুর ষ অবাধে উঠা-বসা, চলা-ফেরা করতে থাকলে অবৈধ মেলামেশার সংখ্যা হ্রাস পাবে। নারী অপহরণ জনিত দুর্ঘটনা থাকবে না। কারণ, তখন নারীদের প্রতি পুর ষের

কৌতুহল কমে যাবে। গোপন ও নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতিই তো মানুষের কৌতুহল বেশী থাকে। তাই আবরণ ও গোপনীয়তার সব জঞ্জাল দর করে দিতে হবে।

(২) উলঙ্গবাদী আন্দোলন সফল হলে কবি, সাহিত্যিক ও লেখকদের লেখায় রস বৃদ্ধি পাবে, রোমান্স বেশী হবে। তখন বাস ৭৫ চাক্ষুস অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে সাহিত্য ভান্ডারে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হবে।

(৩) পোষাক-পরি ছদের পেছনে ব্যয়জনিত বিপুল পরিমাণ জাতীয় অর্থের সাশ্রয় হবে। ফলে তা অন্যান্য জাতীয় কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারবে।

(৪) মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই উলঙ্গ। কারণ, পোষাক-পরি ছদ সহকারে তাদের জন্ম হয়নি। অতএব প্রাকৃতিক চাহিদা অনুসারেই তাদেরক উলঙ্গ থাকতে হবে। এ হলো প্রাকৃতিক দাবী।

এই ছিল উলঙ্গবাদীদের যুক্তির কিয়দংশ। এখন বলুন এমনি ধারার যুক্তি দেয়া হলে পৃথিবীর এমন কোন গর্হিত কাজ থাকবে কি যার স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো যাবে না ? মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি দাড়ি না রাখার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন-হযরত, ইসলাম প্রাকৃতিক ধর্ম, তার কোন নীতিই অপ্রাকৃতিক নয়। অতএব দাঁড়ি না রাখাই সংগত। করণ প্রকৃতিগত বা জন্মগতভাবে মানুষ দাঁড়ি নিয়ে আসে না। বেশ সুন্দর যুক্তি বটে। মাওলানা থানবী (রহঃ) জবাবে বলেছিলেন, তাহলে জনাব নিজের মুখের দাঁতগুলো ভেঙ্গে ফেলুন, কারণ জন্মের সময় ওগুলো আপনার ছিল না। একজন শ্রোতা তখন মন্ব্য করেছিলেন , মাওলানাতো দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে ফেলেছেন! যদি কেউ যুক্তি দিয়ে বলে ইসলাম প্রাকৃতিক ধর্ম, আর প্রকৃতির মাঝে দেখতে পাই বন -জঙ্গলের বড় বড় পশুরা ছোট ছোট পশুদের মেরে খায়, সাগরে বড় বড় প্রাণীরা ছোটদের ধরে খায়। অতএব বড় বড় ধনী-বণিক শ্রেণীরা যদি ছোট গরীব শ্রেণীর লোকদের লুটে পুটে খায়, তাদেরকে শোষণ করে, তাহলে তা অন্যায় হবে কেন ? তাহলে বলুন তো এমনি ধারার যুক্তি চালানো হলে এমন কোন বস্তু থাকবে কি যার স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো যাবে না ? মাতা-পিতাও নিজেদের

সন্তানের সাথে অপকর্ম করতে পারবে এই যুক্তিতে যে, নিজের গাছের ফল ভোগ করার অধিকার নিজেরই সবচেয়ে বেশী।

অথচ যুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মানুষ জন্মগতভাবে অনুসন্ধিৎসু। একমাত্র মানুষের মনই রহস্য উদঘাটনের জন্য কৌতুহলী। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে অনুসন্ধিৎসা বা জানার এ উৎকন্ঠা নেই। ম্লান বদনে সবকিছু সয়ে নেয়াই এদের প্রকৃতি। কিন্তু মনুষ সবকিছুকে জানতে চায়, সব রহস্য উদঘাটন করতে চায়। তার জানার আবেগ উৎকন্ঠার কোন শেষ নেই, সীমা নেই। যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করে সবকিছুর সত্যাসত্য নিরূপন করার প্রবণতা তার মজ্জাগত। অতএব যুক্তি একটা চির সত্য ব্যাপার। এর প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু যুক্তির মতিগতি যদি এরকমই হয় তাহলে সে যুক্তি কতটা যুক্তিযুক্ত তা অবশ্যই বিচার্য। আবার ইদানিং বরং আরও অনেক পর্ব থেকেই কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় কোন বিধি-বিধান বা অনুশাসনের কথা বলা হলে চট জলদি যুক্তি চেয়ে বসেন কিংবা এটা যুক্তিযুক্ত নয় বলে বেঁকে বসেন। তাদেরকে যুক্তি দেয়া হলেই যে তারা মেনে নেন তা নয় বরং হয়তো বা বিপরীত যুক্তি পেশ করেন, না হয় পেশকৃত যুক্তি তার মনঃপত নয় বলে মন্তব্য করে বসেন। আসলে যুক্তি তাদের কাম্য নয়। যুক্তির কথা বলে গা এড়ানোই হল তাদের মতলব। কিন্তু সরাসরি ধর্মীয় বিধান মানি না বললে যে বিড়ম্বনা সৃষ্টি হবে তার থেকে আত্মরক্ষার সহজ হাতিয়ার হিসেবেই যুক্তি চাওয়া হয়ে থাকে। অন্যথায় ধর্মীয় বিধি-বিধানের স্বপক্ষে এত বিপুল পরিমাণ যুক্তি- প্রমাণ বই পুস্কে লিপিবদ্ধ রয়েছে যা তাদের মাথায় চাপিয়ে দিলে নির্ঘাত ঘাড়টা মটকে যাবে। অবশ্য এখানে দু'টো দিক রয়েছে। প্রথমতঃ ধর্মীয় বিধি-বিধান বা অনুশাসনকে ম্লান বদনে মেনে নেয়া এবং পরে মনের তৃপ্তি বা দৃঢ়তা লাভের জন্য কিংবা শত্রপক্ষের জবাব দেয়ার জন্য খোদায়ী বিধি-বিধানের হিকমত ও যুক্তি অন্বেষণ করা। এটা মন্দ নয় বরং কুরআন হাদীছের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয়। কুরআন হাদীছে বিভিন্ন স্থানে চিন্তা গবেষণার জন্য চিন্তাশীল ও জ্ঞানীজনদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে এবং যুগে যুগে মুসলিম দার্শনিকরা তাদের গবেষণালব্ধ গ্রন্থও রচনা করেছেন। সুতরাং এদিকটি অবশ্যই প্রশংসার

যোগ্য। অন্য একটি দিক হল ধর্মীয় বিধি-বিধানের যুক্তি ও রহস্য হৃদয়ঙ্গম বা তা মনঃপুত না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত না হওয়া। অর্থাৎ, যুক্তিকে ধর্মের পর্বে স্থান দেয়া, অন্য কথায় যুক্তিকে ধর্মের মাপকাঠি বানানো। যেমনটি করেছিল মু'তাযিলা নামক একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়। এটা কুরআন হাদীছের দৃষ্টিতে ঠিকতো নয়ই ৭৭ যুক্তির বিচারেও ধর্মীয় বিধি-বিধান মানার পর্বে যুক্তি অন্বেষণ করতে যাওয়াটা অযৌক্তিক। কারণঃ

(ক) ধর্মীয় বিধি-বিধানের উৎস আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী, এক কথায় ওহী। আর যুক্তির উৎস হল কল্পনা। এই কল্পনা কখনও ভুলের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। অথচ আল্লাহ ও রাসূলের বাণী বা ওহী নিশ্চিতভাবেই ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে (অন্ততঃ মুসলমানের ঈমানের খাতিরে এ বিশ্বাস থাকতেই হবে)। আর বাস্তবেও অনেক সময় পূর্ববর্তীদের যুক্তিতে ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ধর্মীয় বিধি-বিধানে এতটুকু ভুল কোন দিন পাওয়া যায়নি। বরং বিজ্ঞানের উন্নতির পর্যায়ে পর্যায়ে প্রতিনিয়ত ধর্মীয় বিধি-বিধানগুলোর যৌক্তিকতাই বেশী করে প্রমাণিত হয়ে চলেছে। অতএব সন্দেহ পূর্ণ বিষয় (যুক্তি) দ্বারা সন্দেহাতীত বিষয়কে (ধর্মকে) মাপতে যাওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

(খ) যুক্তির উপর নির্ভর করে কোন কিছু গ্রহণ করা ক্ষেত্র বিশেষে ভুলটাকে গ্রহণ করারই নামান্তর। কারণ ব্যক্তির উদঘাটিত রহস্য বা তার সৃষ্ট যুক্তি সংশ্লিষ্ট বিধানের মূল কারণ বা হাকীকত নাও হতে পারে। এমনকি তার বিপরীতও হতে পারে।

(গ) ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অবশ্যই মানতে হবে, এক্ষেত্রে মানার পর্বে প্রশ্ন বা যুক্তির উপর তাকে ঝুলিয়ে রাখা অনেক সময় না মানা অর্থাৎ কুফ্রীর দিকে নিয়ে যেতে পারে। কারণ, প্রশ্নের জবাব অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নই বাড়াতে থাকে, মানতে বাধ্য করে না। বরং প্রশ্নের বহর বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে সংশয় ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়। যা না মানার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(ঘ) যুক্তি ব্যক্তি মনের কল্পনা থেকে উদ্ভূত হওয়ায় একান্ত ভাবেই তা আপেক্ষিক ও ব্যক্তি কেন্দ্রিক। একজনের নিকট যা যুক্তিযুক্ত

অন্যের কাছে তা যুক্তি গ্রাহ্য নাও হতে পারে। তদুপরি মানুষের জ্ঞান ও তার মনের চিন্তা-ভাবনা সমকালীন ধ্যান-ধারনা ও আবহাওয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তাই কোন যুক্তিই শাশ্বত ও সর্বকালীন হতে পারে না। পক্ষান্তরে আলণ্ঢাহ্‌র জ্ঞান নির্দিষ্ট, স্থান কাল ও পাত্রের গন্ডি থেকে মুক্ত, ৭৮ প্ত। তাই তার দেয়া বিধান সার্বজনীন, সর্বকালীন ও শাশ্বত হয়ে থাকে । সুতরাং যুক্তির সাথে আলণ্ঢাহর বিধানকে সংযুক্ত করার অর্থ হল সার্বজনীনকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সর্বকালীন ও শাশ্বতকে কালকেন্দ্রিক করে দেয়া। এটা আদৌ মেনে নেয়া যায় না।

তদুপরি ধর্মের কোন বিধি-বিধান কে যুক্তির উপর নির্ভরশীল মনে করার অর্থই হল আলণ্ঢাহর জ্ঞানকে মানুষের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল মনে করার মত ঔদ্ধত্য দেখানো। তাছাড়া এটা ধর্মের প্রতি আস্থাহীনতার পরিচায়কও বটে। অবশ্য যারা এ ধরনের যুক্তি চেয়ে থাকেন, তারা এসব কথা বুঝেন না তা নয়। কিন্তু আগেই বলেছি আসলে তাদের মতলব খারাপ ; তবে ব্যতিক্রম সবখানেই থাকে। গড়পড়তা সকলের গোষ্ঠি উদ্ধার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যখনই কাউকে যুক্তি দিতে বা চাইতে দেখি বিশেষতঃ যদি তা হয় ধর্মীয় বিধি-বিধানের বিপক্ষে কিংবা পার্থিব বিষয়ে বিবদমান দুইটি দলের মধ্যে, তখনই মনে হয় লোকটির 'কথা সত্য, মতলব খারাপ' নয় তো ?

এমনিভাবে জীবনের বহু ক্ষেত্রেই 'কথা সত্য,মতলব খারাপ'-এর অভিব্যক্তি দেখতে পাই। খারেজীদের লক্ষ্য করে বলা হযরত আলী (রাঃ)-এর সেই বিজ্ঞোচিত কথা "কালিমাতু হাক্‌কিন উরীদা বিহাল বাতিল" (কথা সত্য ; মতলব খারাপ) যেন এক শাশ্বত কথা।

(সমাপ্ত)